২

সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞাতিত্ব

Social Structure and Kinship

জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে সাংস্কৃতিক/সামাজিক নৃবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ইতিহাস আর নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস, দুটোই প্রায় দেড়শ বছর পুরোনো। নৃবিজ্ঞানে জ্ঞাতিত্বের কেন্দ্রিকতার কারণ হচ্ছে, প্রাথমিক যুগের নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে অপাশ্চাত্য সমাজের সামাজিক সংগঠনের মূলনীতি হচ্ছে জ্ঞাতি-বন্ধন। তাঁরা বিশ্বের সকল সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন: পাশ্চাত্য অর্থাৎ 'উন্নত', 'সভ্য' এবং অপাশ্চাত্য অর্থাৎ 'অনুন্নত', আদিম/বর্বর সমাজ। তাঁদের তাত্ত্বিক পূর্বানুমান মতে, উন্নত ও সভ্য সমাজে, সমাজকে সংগঠিত করবার মূলনীতি কেবলমাত্র জ্ঞাতি-বন্ধন নয়। এ ধরনের সমাজে রয়েছে অপরাপর প্রতিষ্ঠান যেমন, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র; কিন্তু অনুন্নত, রাষ্ট্রবিহীন সমাজে জ্ঞাতি-বন্ধনই সর্বেসর্বা। জ্ঞাতি বন্ধন সমাজকে সংগঠিত করে, সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখে। জ্ঞাতিত্বের মূলে রয়েছে মানুষের প্রজনন, এটি হচ্ছে একটি জৈবিক এবং প্রাকৃতিক বিষয়। প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতি হিসেবে মানুষের টিকে থাকা যেমন নিশ্চিত হয়, ঠিক একইভাবে জ্ঞাতি-বন্ধনের সাহায্যে (আদিম) সমাজের টিকে থাকা নিশ্চিত হয়। এই দৃষ্টি অনুসারে, জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে আদিম/বর্বর সমাজকে বোঝার চাবিকাঠি। হাল আমলের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে একটি সমালোচনামনষ্কশু ধারা তৈরী হচ্ছে যেটি এই ধরনের পূর্বানুমান ও তত্ত্ব জগতের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। বিশ্লেষণে আধিপত্য, বৈষম্য, ক্ষমতা এবং পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক, এই প্রসঙ্গগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

এই পাঠ্য বইতে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন সংক্রান্ত যে তিনটি ইউনিট (মোট চৌদ্দটি পাঠ) রয়েছে, সেগুলোতে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের এই দেড়শ বছরের যাত্রাকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এই ইউনিটের প্রথমে রয়েছে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা। এর লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমানে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে যে বিষয়গুলো পঠিত, এবং যে পদ্ধতি মোতাবেক পঠিত, তার জন্য আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রস্তুত করে তোলা। দ্বিতীয় পাঠে প্রধান কিছু তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঘটানো হবে। নৃবিজ্ঞান (এবং সামাজিক বিজ্ঞান) বোঝার জন্য, ব্যবহার করার জন্য, এই ন্যূনতম পরিচিতি জরুরী। বাকী তিনটি পাঠে জ্ঞাতি পদাবলী, বংশধারার তত্ত্ব ও মৈত্রীবন্ধন তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে। এই বিষয়গুলো বিশেষ তাত্ত্বিক ধারা এবং বিশেষ সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করে।

◆ পাঠ-১ : জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন ও তার পাঠ পদ্ধতি
◆ পাঠ-২ : জ্ঞাতিত্ব : জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব
◆ পাঠ-৩ : জ্ঞাতিত্ব পদাবলী
◆ পাঠ-৪ : বংশধারা তত্ত্ব
◆ পাঠ-৫ : মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব

পাঠ - ১

জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন ও তার পাঠ পদ্ধতি
Kinship Studies: An Orientation

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- জ্ঞাতিত্ব সামাজিক/সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়
- প্রেক্ষিতকরণের গুরুত্ব
- ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীদের কাছে নিজ সমাজ স্বাভাবিকতার মানদন্ড হিসেবে কাজ করে
- ভাষা বিশ্লেষণ সামাজিক ক্ষমতা এবং স্বার্থ উদ্ঘাটনের একটা রাস্তা

জ্ঞাতিত্ব সাংস্কৃতিক/সামাজিক নৃবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। আপনারা ইতোমধ্যে জানেন যে বহু ইউরোপীয় দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে নৃবিজ্ঞান এথনোলজি (জাতিতত্ত্ব) হিসেবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, ধরে নেয়া হয়েছিল নৃবিজ্ঞানীদের কাজ বা লক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর এথনোগ্রাফি রচনা। এখনো কিছু ইউরোপীয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ এথনোলজি নামে পরিচিত। প্রথম এথনোগ্রাফি রচয়িতা বহিসেবে যিনি স্বীকৃত তিনি লুইস হেনরি মর্গান (১৮১৮-১৮৮১)। মর্গান তাঁর রচিত *লীগ অফ দ্য ইরোক ওয়া* (১৮৫১) গ্রন্থে আমেরিকার আদিবাসী *ইরোকওয়া*'দের ধর্ম, রাজনীতি ও অনুষ্ঠান পালন – এসব বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে জ্ঞাতিত্ব ও বিয়ের উপর আলোকপাত করেন। জ্ঞাতিত্ব ও বিয়ে নিয়ে তাঁর আগ্রহ পরবর্তী পর্যায়ে আরো ধারাবাহিক হয়ে ওঠে এবং বিশ বছর পর তার *সিস্টেমস অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি এ্যান্ড এফফিনিটি* (১৮৭১) বইটি প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভে এই বইটি একটি মাইলফলক। উপরন্তু, নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জ্ঞাতিত্ব এবং বিবাহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয় – এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জ্ঞাতিত্ব বলতে কি বোঝায়, অর্থাৎ কি এর সংজ্ঞা, কি এর গুরুত্ব, কি এর পরিধি – এগুলো অনড়, অটল অথবা অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। গত দেড়শ বছর এগুলোর ক্ষেত্রে বদল ঘটেছে, এবং এই বদল চলমান।

জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন-এর ইতিহাস আর নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস – দুটোই প্রায় দেড়শত বছর পুরোনো। সেটা নিশ্চয়ই আপনারা উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পেরেছেন। তবে, জ্ঞাতিত্ব বলতে কি বোঝায়, অর্থাৎ কি এর সংজ্ঞা, কি এর গুরুত্ব, কি এর পরিধি – এগুলো অনড়, অটল অথবা অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। গত দেড়শ বছর এগুলোর ক্ষেত্রে বদল ঘটেছে, এবং এই বদল চলমান। যেমন ধরুনঃ মর্গানের সময়কাল। তখন বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সকল বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিক একইভাবে পরিবার, বিয়ে, অথবা গোত্র-ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশকে দেখেছেন। অন্যভাবে বললে, যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে, চিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক, গবেষকদের মাঝে তর্ক-বির্তক চলতে থাকে। ভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হলে তো অবশ্যই, আবার একই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হলেও আমাদের ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে সকলে, সব বিষয়ে, সব সময়ে একমত। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবেন, একই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হওয়ার অর্থ হচ্ছে কিছু পূর্বানুমান (assumptions) এবং কিছু প্রত্যয়ে (concepts) অংশীদারিত্ব। এ কারণে যেমন স্ব মিলের জায়গা তৈরী হয়, আবার কিছু বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর সম্ভাবনাও থাকে।

জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের এই দেড়শত বছরের যাত্রা – শুরুর লগ্নের ভাবনাচিন্তা, তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক এবং হাল আমলের মনোযোগের জায়গার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক অতি সংক্ষেপে জ্ঞাতিত্ব বিষয়ক তিনটি ইউনিটে (মোট ১৪টি পাঠ-এ) তুলে ধরা হবে।

প্রেক্ষিতকরণ

জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের বিষয়গুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে ঘিরে। এই যেমন ধরুন, বাবা-মা, বিয়ে, ঘর-সংসার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, পরিবার, সন্তান জন্মদান, শরীরী সম্পর্ক, পিতৃ পরিচয় – আরো অনেক কিছু। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন যেসব বিষয় ঘিরে গঠিত সেসব বিষয় আপনার, আমার, আমাদের সত্তা, পরিচিতি, মূল্যবোধ, দৈনন্দিন জীবন-যাপন, কার্যকলাপ, ঠিক-বেঠিকের ধারণা, নীতি-নৈতিকতা এসবকে বিশ্লেষণের খাতিরে, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থাপন করে। প্রেক্ষিত বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট স্থান-কাল। তার মানে, "পরিবার"এর কথা উঠলে *কোন* সমাজের পারিবারিক সম্পর্কের কথা বলছি, তা স্পষ্ট করা জরুরী। আবার, একই সমাজের কথা বললেও – যেমন ধরুন বাঙ্গালি মুসলমান সমাজ – *কোন* সময়কালের কথা বলছি, তার সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যিক।

জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন যেসব বিষয় ঘিরে গঠিত সেসব বিষয় আপনার, আমার, আমাদের সত্তা, পরিচিতি, মূল্যবোধ, দৈনন্দিন জীবন-যাপন, কার্যকলাপ, ঠিক-বেঠিকের ধারণা, নীতি-নৈতিকতা এসবকে বিশ্লেষণের খাতিরে, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থাপন করে। প্রেক্ষিত বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট স্থান-কাল।

বিষয়টিকে আরো খোলাসা করি। বাঙ্গালি মুসলমান সমাজে ধরুন, "বিয়ে" নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রশ্ন উঠবে: কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে? বৃটিশরা এদেশে আসার আগে নাকি পরে? সাম্প্রতিককালের গবেষণায় জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের প্রায় দুইশত বছরের শাসনামলে এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণার সূত্রপাত ঘটায় যা এদেশের মানুষজনের জীবনধারায় (way of life বা culture) মৌলিক বদল আনে। ঔপনিবেশিক শক্তি শুধুমাত্র অর্থনীতি বা রাজনীতির ক্ষেত্রে বদল ঘটায়নি। পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, বিয়ে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বদল ঘটিয়েছে। অথবা, বিষয়টাকে এভাবে বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বড় ধরনের বদল ঘটিয়েছে (প্রতিষ্ঠান গঠন, নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি) যা এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলেছে। এবং, গভীর ও সামগ্রিক বদল করে তুলছে আবশ্যিক, অনিবার্য। এর প্রভাব এদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনেও প্রতিফলিত হয়েছে। এবং বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী চলে যাবার পরও তাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা টিকে আছে।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বড় ধরনের বদল ঘটিয়েছে (প্রতিষ্ঠান গঠন, নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি) যা এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলেছে। এবং, গভীর ও সামগ্রিক বদল করে তুলছে আবশ্যিক, অনিবার্য।

এই প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজনীয়। <u>প্রথমত</u>, বৃটিশ উপনিবেশকালের প্রভাব "ভালো", বা "মন্দ" দিয়ে বোঝা যাবে না। বিষয়গুলো অত সহজ, সরল নয়। আরো তলিয়ে দেখা, গভীরভাবে দেখা জরুরী। <u>দ্বিতীয়ত</u>, পরিবার, বিয়ে, বংশ-পরিচয় – এ সকল বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতি বা অর্থনীতি সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু মনে রাখা জরুরী যে, এই আন্তঃসম্পর্ক সহজ এবং সরল নয়, বরং জটিল। ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রত্যক্ষ। <u>তৃতীয়ত</u>, সমাজে যে বিভাজনগুলো বিদ্যমান, যেমন ধরুন শ্রেণী ও জাতিগত বিভাজন, আরো ধরুন, ধর্মীয় ভিন্নতা – এগুলো জ্ঞাতি সর্ম্পককে (উদাহরণস্বরূপ, বিয়ে), জ্ঞাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে (উদাহরণস্বরূপ, বংশ) ভিন্নতা দান করে। একই দেশের বাসিন্দা হলে কি হবে, গরিব পরিবারের সন্তানের ভূমিকা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের ভূমিকা থেকে ভিন্ন। গরিব পরিবারের সন্তান অল্প বয়স হতে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির কাজ করেন। অথবা, নিজ ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন পক্ষান্তরে, মধ্যবিত্ত সন্তান দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিবারের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকেন। একই দেশের বাসিন্দা হলে কি হবে, মান্দাই (যাদের বাঙ্গালিরা নেতিবাচক গারো নামে ডাকেন)-দের বংশধারা মাতৃসূত্রীয়, আর বাঙ্গালিদের হচ্ছে পিতৃসূত্রীয়। বাঙ্গালি হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় কাজিন-বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু বাঙ্গালি মুসলমান সমাজে এর প্রচলন রয়েছে। আবার, বাঙ্গালি হিন্দু কি বাঙ্গালি মুসলমান, মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাত্রই সন্তান অল্প বয়স থেকে আয়করী ভূমিকা গ্রহণ করে না। এক কথায় বললে, বিভিন্ন সূত্র (শ্রেণী, জাতি, ধর্ম) জ্ঞাতিসম্পর্ককে ভিন্নতা, আবার সমরূপতা দান করে। আবার একই সাথে লক্ষ্যণীয়, শ্রেণী, জাতি, ধর্মীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও, গড়ে সকল জনগোষ্ঠীর পুরুষেরা, তাদের নিজ জনগোষ্ঠীর নারীদের তুলনায় ক্ষমতাশালী। এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। বদল রাতারাতি ঘটে না, আবার সকল ক্ষেত্রে একইভাবে বা সমভাবে বদল ঘটে না। <u>চতুর্থত</u>, জ্ঞাতিসম্পর্ক অনড়, অটল, অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। এগুলো বদলায়। বদলের ধরন কি তা অনুসন্ধানযোগ্য। অনুসন্ধান না করে ঢালাও ভাবে কিছু বলা ঠিক নয়। এসব বিষয় আরো বিস্তারিতভাবে পরবর্তী পাঠগুলোতে আলোচিত হবে।

কথা হচ্ছিলো জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে যেসব বিষয় পঠিত তা কিভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, আমাদের সত্তা, আত্ম-পরিচিতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত। এই বিজড়ন বিষয়গুলো বোঝার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সমস্যা তৈরী করতে পারে। ধরুন, একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী যখন তাঁর বিষয় নিয়ে কথা বলেন, তখন তার কথা আমরা নিরঙ্কুশ ভাবে মেনে নেইনি। তিনি ইলেকট্রন, প্রোটনের সংজ্ঞা দিতে চাইলে তাঁর সাথে আমরা বিতর্কে নামি না। ধরে নিই তিনি যা বলছেন তা বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের জ্ঞান স্বল্প, সীমিত। কিন্তু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়াদির ক্ষেত্রে, যেহেতু আমরা সকলেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, অথবা জন্মগ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে করি এবং নির্দিষ্ট পারিবারিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, আমরা নিজের বা নিজেদের ধারণা, নিজের বা নিজেদের কার্যকলাপ ঠিক এবং সবচাইতে গ্রহণযোগ্য, স্বাভাবিক বলে মনে করে থাকি। ভিন্ন ধরনের কিছু শুনলে আমরা ধাক্কা খাই, হয়তো বা আতঙ্কিত হই। ধরুন, "বাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব তার মায়ের"; "মায়ের স্নেহ, পরিচর্যা না পেলে বাচ্চা হয় বেয়াড়া অথবা রুগ্ন হয়ে উঠতে বাধ্য" – এই ধারণা ইলেকট্রন, প্রোটনের মতো বিমূর্ত (abstract) বা দূরের নয়। বাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব আসলে কার – এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় ধারণা আছে, যা আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের অংশ।

প্রচলিত ধ্যান-ধারণা

সাম্প্রতিক কালের নৃবিজ্ঞানের একটি ধারা স্বাভাবিকত্বের (normalcy) ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরী মনে করছে। এই মহলের নৃবিজ্ঞানীদের যুক্তি হ'ল, বিশেষ কিছু ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সামাজিক স্বার্থ কিভাবে টিকে আছে, এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে – সেটি বোঝা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সঠিক-বেঠিকের ধারণা শক্তিশালী, এবং সামাজিক। এই ধারণার শক্তিমত্তার ভিত্তি প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ নয়। তার মানে, কেউ আমাদের নিরন্তর মারধর করে এসব ধারণা গ্রহণে বাধ্য করছে না। তবে বলপ্রয়োগ, অথবা চাপপ্রয়োগ শর্ত হিসেবে কাজ করে। বিশেষ সময়কালে, বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট জীবনযাপন প্রণালী স্বাভাবিক মনে হয়। স্বাভাবিকত্বের ধারণা সামাজিক ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত, যেমন: শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতিসত্তা ইত্যাদি। অনেকে বলবেন, স্থানিক সামাজিক সমস্যা বিশ্বব্যাপী বৈষম্য ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, বহু ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ ভাবে। সাম্প্রতিক কালের নৃবিজ্ঞানের একটি ধারা স্বাভাবিকত্বের (normalcy) ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরী মনে করছে। এই মহলের নৃবিজ্ঞানীদের যুক্তি হ'ল, বিশেষ কিছু ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সামাজিক স্বার্থ কিভাবে টিকে আছে, এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে – সেটি বোঝা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। একই সাথে তারা উদ্‌ঘাটন করছেন কিভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীরা তাদের নিজ সমাজের স্বাভাবিকত্বের ধারণা নিয়ে ইউরোপের বাইরের (অ-ইউরোপীয়) সমাজে গবেষণা করেছিলেন। ইউরোপীয় সমাজের স্বাভাবিকত্বের ধারণার মাপকাঠিতে অন্যান্য সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা, মূল্যায়ন ও বিচার করেছিলেন।

সামাজিক স্বার্থ উদ্‌ঘাটনের একটা রাস্তা হ'ল - ভাষা বিশ্লেষণ ।

সামাজিক স্বার্থ উদ্‌ঘাটনের একটা রাস্তা হ'ল, এই দৃষ্টিভঙ্গির নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ভাষা বিশ্লেষণ। প্রাত্যহিক জীবনে উচ্চারিত ভাষা – মতামত, ভাবনা – সমাজের সকল মানুষের অভিজ্ঞতা, কিংবা ভাবনা, কিংবা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ বা প্রকাশ করে না। সমাজে ক্ষমতাশালী যারা – অর্থবিত্তের দিক দিয়ে, মান-মর্যাদায়, লিঙ্গীয় বা জাতিগত পরিচয়ে – তাদের ভাবনাচিন্তাও শক্তিশালী। তাদের সামাজিক অস্তিত্ব নিম্নবর্গের মানুষজনের জীবনযাপন শুধু নয়, চিন্তাকেও প্রান্তিক বা কোণঠাসা করে তোলে। এবং এই নৃবিজ্ঞানীরা বলবেন, ভাষা যেহেতু জীবনযাপন প্রণালীকে, অভিজ্ঞতাকে আকৃতি দেয় ("বাবা মারা যাওয়াতে পুরো পরিবার পথে বসে গেছে", "মামা'দের অবস্থা ভালো ছিল, ওদের অসুবিধা হয় নাই") ভাষা বিশ্লেষণের রাস্তা হল, কোন উক্তি, অভিমত বা বক্তব্যকে সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিংবা তা সকলের মতামতকে প্রতিফলিত করে – এটা ধরে না নেয়া। অর্থাৎ, যা উচ্চারিত হয় সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো করা জরুরী: কে বলছে? কার/কাদের সম্বন্ধে বলছে? বলার মধ্যে দিয়ে কি প্রকাশিত হচ্ছে, কি উহ্য থেকে যাচ্ছে? তাঁরা বলবেন, জরুরী হচ্ছে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত, দুটো বক্তব্যকেই নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করে সেটির বিশ্লেষণ করা। বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য আবার পূর্বের উদাহরণে ফিরে যাই: "বাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব তার মায়ের"। এই বাক্যে মায়ের দায়িত্ব যেমন

উপস্থিত করে তোলা হচ্ছে, বাবার দায়িত্বকে অনুপস্থিত করে রাখা হচ্ছে। আবার, মা বলতে জৈবিক মা-কেই বোঝান হয়েছে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত, এবং শক্তিশালী, এ ধরনের কিছু বক্তব্য নিচে হাজির করা হচ্ছে। আপনার কাজ হচ্ছে এগুলো নিয়ে ভাবা। যেমন ধরুন, পরিবার নিয়ে একটা কথা প্রায় উচ্চারিত হয়ে থাকে:

> *"যুগ যুগ ধরে পরিবার ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রূপে টিকে আছে"।*

এ ধরনের ভাবনা কি প্রকাশ করে? কোন পরিস্থিতিতে এটা কে বা কারা উচ্চারণ করে থাকে? পরিবারের অপরিবর্তনশীলতার এই ধারণা কি আমরা সঠিক বলে ধরে নিতে পারি? আবার খেয়াল করে দেখেন, জ্ঞাতি-পরিবার-বিয়ে, এসব বিষয়ে নানান কথা অহরহ উচ্চারিত হয় "বর্বর" এবং সভ্য এই মানদন্ড অনুসারে। এর নানান কাল্পনিক নমুনা উপস্থাপন করা যায়। যেমন:

> *"পৃথিবী জুড়ে ট্রাইবালরা অসভ্য। ওদের নীতি-নৈতিকতা বোধ কম...। ওদের সভ্য করে তোলা হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের দায়িত্ব"।*

সাম্প্রতিক কালের কিছু নৃবিজ্ঞানীদের অবস্থান হচ্ছে: সভ্য-অসভ্যতার মানদন্ড তৈরী হয়েছে ঐতিহাসিকভাবে। আফ্রিকা এবং এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। কয়েক 'শ বছরের ঔপনিবেশিক সময়কালে এই শক্তিশালী ধারণাগুলো প্রতিষ্ঠা পায় যে, পাশ্চাত্য সমাজ হচ্ছে "সভ্য" এবং অপাশ্চাত্য সমাজ হচ্ছে "অসভ্য"। এবং এই ধারণাগুলো স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠে। মজার ব্যাপার হ'ল বিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপীয় শাসনের অবসান ঘটে এবং তারপর, যখন একটি গড়ে-ওঠা দেশীয় শাসক গোষ্ঠী স্বাধীন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন, তাঁরা নিজ দেশের গরিব, নিপীড়িত মানুষজনকে একই ভাষায় চিত্রিত করা, কিংবা গাল-মন্দ করা, আরম্ভ করেন।

নিম্নবর্গের মানুষজন যেমন কিনা গরিবদের ক্ষেত্রে এধরনের বিদ্বেষমূলক কথা প্রায়-প্রায় শুনে থাকি আমরা:

> *"ছোটলোকেরা শুধু বাচ্চা পয়দা করতে পারে, কিন্তু কই, তাদের তো মানুষ করতে পারে না"*
>
> *"গরিবের বিয়ের কি আর ঠিক-ঠিকানা আছে? এই মুহূর্ত বিয়ে করে, পর মুহূর্তে ছাড়ে";*
>
> *"আচার-আচরণ দেখলেই বোঝা যায় কে ভদ্র ঘরের সন্তান"।*

বিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপীয় শাসনের অবসান ঘটে এবং তারপর, যখন একটি গড়ে-ওঠা দেশীয় শাসক গোষ্ঠী স্বাধীন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন, তাঁরা নিজ দেশের গরিব, নিপীড়িত মানুষজনকে একই ভাষায় চিত্রিত করা, কিংবা গাল-মন্দ করা, আরম্ভ করেন।

সমস্যা ভদ্রতা নিয়ে নয়। সমস্যা হচ্ছে, ধরে নেয়া হয় যে, একটি বিশেষ শ্রেণী (বড় লোক)-র মানুষ ভদ্র। এবং সমাজে কেবলমাত্র তারাই ভদ্র। ভদ্রতার যে মাপকাঠি যেমন পোশাক-আশাক, স্বাস্থ্য, চেহারা-সুরত, আত্মবিশ্বাস এগুলো মূলত শ্রেণীগত ব্যাপার। এধরনের প্রত্যক্ষ, দৃশ্যমান বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করলে অপ্রত্যক্ষ এবং মৌলিক বিষয় থেকে আমাদের দৃষ্টি সরে যায়। এটি সামাজিক বিষয়াদি বুঝতে সমস্যা তৈরী করে। শ্রেণী হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈষম্যভিত্তিক একটি ব্যবস্থা। আবারো উল্লেখ্য করা জরুরী, সমস্যা ভদ্রতা নিয়ে নয়। সমস্যা হচ্ছে, সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে উচ্চ শ্রেণীর মানুষজন, এবং কেবলমাত্র তারাই, ভদ্র। অন্যান্য শ্রেণীর মানুষজন – গরিব, দুঃস্থ, খেটে-খাওয়া মানুষজন মাত্রই অভদ্র।

"সভ্য-অসভ্য", "ভদ্র-অভদ্র" যেমন শক্তিশালী মানদন্ড, একইভাবে "পাশ্চাত্য-অপাশ্চাত্য" – এটাও একটা শক্তিশালী মানদন্ড হিসেবে কাজ করে থাকে এবং প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এই মানদন্ড ভাষার মাধ্যমে স্বতঃসিদ্ধ করে থাকি। পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে প্রায়শই দুই ধরনের ঢালাও মন্তব্য শোনা যায়:

ঢালাও মন্তব্য কিংবা সাধারণীকরণ আমাদের সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে না। বরং, বহু ক্ষেত্রে, ঢালাও মন্তব্য করা হয় বিদ্যমান কোন সমস্যার উপস্থিতি অস্বীকার করতে। এ কারণে, যে কোন বক্তব্য কিংবা উক্তি কিংবা মন্তব্যের ব্যাপারে, চিন্তাভাবনার ব্যাপারে, আমরা কি প্রক্রিয়ায় ভাবি, কোন ধরনের জিনিসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি এগুলো নিয়ে ভাবা জরুরী।

> *"পাশ্চাত্য দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে উন্নত কিন্তু পরিবারে স্থিতিশীলতা নাই...। ওখানে তো শুনি কথায় কথায় ডিভোর্স হয়...। আমাদের দেশ উন্নত না হলেও কি হবে, অন্ততঃ ওদের মতন বিশৃঙ্খল তো আর না। অবশ্য আজকাল ......"*

লক্ষ্য করা জরুরী, কে বলছে, কোন প্রেক্ষিতে বলছে? এটা বলে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন তিনি? আবার, পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে একেবারে ভিন্ন, ইতিবাচক, ঢালাও মন্তব্য শোনা যায়, যেমন:

> *"পাশ্চাত্য দেশগুলি ভালো: নারী-পুরুষের সমান অধিকার আছে, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে... আমাদের দেশে তো সবকিছু চাপিয়ে দেয়া হয়..."*

ঢালাও মন্তব্য কিংবা সাধারণীকরণ সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে আমাদের সাহায্য করে না। বরং, বহু ক্ষেত্রে, ঢালাও মন্তব্য করা হয় বিদ্যমান কোন সমস্যার উপস্থিতি অস্বীকার করতে। এই কারণে, যে কোন বক্তব্য কিংবা উক্তি কিংবা মন্তব্যের ব্যাপারে, চিন্তাভাবনার ব্যাপারে, আমরা কি প্রক্রিয়ায় ভাবি, কোন ধরনের জিনিসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি এগুলো নিয়ে ভাবা জরুরী।

সারাংশ

উপরের আলোচনাকে সংক্ষেপ করলে এরকম দাঁড়ায়: জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের বিষয় প্রাত্যহিক জীবনকে ঘিরে। নৃবিজ্ঞানীর একটি প্রধান কাজ হচ্ছে প্রেক্ষিতকরণ (contextualization)। প্রেক্ষিতকরণ বলতে বোঝায় স্থান-কাল নির্দিষ্টকরণ অর্থাৎ, যেহেতু ঢালাও বক্তব্য বাস্তব অবস্থা, জটিলতা বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে সে কারণে সেটাকে নিরন্তর এড়িয়ে চলা জরুরী। নিজ সমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার, প্রথা অনেকাংশেই সেই সমাজের অধিবাসীর কাছে "স্বাভাবিক" মনে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীরা নিজ সমাজকে স্বাভাবিকত্বের মানদন্ড ধরে নিয়েছিলেন। হাল-আমলের নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ক্ষমতা এবং সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে স্বাভাবিকতা সম্পর্ক-যুক্ত এবং এটাই হওয়া উচিত অনুসন্ধানের বিষয়। ভাষা বিশ্লেষণ হচ্ছে সামাজিক ক্ষমতা এবং স্বার্থ উদঘাটনের একটা রাস্তা। ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী সর্বদা মাথায় রাখেন যে, সামাজিক অবস্থা এবং অভিজ্ঞতা সকলের একরকম নয়, সেকারণে তিনি মনোযোগ দেন এসব বিষয়ের উপর: কে বলছে? কার/কাদের সম্বন্ধে বলছে? এই পুনরুচ্চারণের মধ্য দিয়ে কি কি বিষয় "সত্য" হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। প্রথম এথনোগ্রাফি রচয়িতা কে?

ক. ম্যালিনেস্কি
খ. ক্লদ লেভি - স্ট্রস
গ. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন
ঘ. লুইস হেনরী মর্গান

২। মর্গানের ‘লীগ অফ দ্য ইরোক ওয়া’ কত সালে প্রকাশিত হয়?

ক. ১৮৫১
খ. ১৮৪১
গ. ১৮৬১
ঘ. ১৮৩১

৩। স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভে কোন বইটিকে একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকার করা হয় -

ক. সিস্টেমস অফ অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি এ্যান্ড এফফিনিটি
খ. লীগ অফ দ্য ইরোক ওয়া
গ. এনশিয়েন্ট সোসাইটি
ঘ. এফফিনিটি এ্যাজ এ ভ্যালিউ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নৃবিজ্ঞানের সূচনালগ্নে কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী ছিল? এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সকল অনুসারীরা কি একইভাবে ভাবতেন?

২। কোন কোন সূত্র জ্ঞাতিসম্পর্ককে ভিন্নতা দান করে, আবার সমরূপতাও তৈরী করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রেক্ষিতকরণ কী? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২। সঠিক-বেঠিকের ধারণা শক্তিশালী এবং সামাজিক। উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

জ্ঞাতিত্ব : জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব
Kinship : Definition and Importance of Kinship

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নৃবিজ্ঞানের প্রধান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি
- প্রাচ্যবাদের ধারণা
- পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় "আদিম" এবং "সভ্য" হিসেবে সমাজের বিভাজন
- জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা এবং নৃবিজ্ঞানের জন্য জ্ঞাতিত্বের গুরুত্ব

সমাজ এবং জ্ঞাতিত্ব, এগুলো হচ্ছে প্রত্যয়। অর্থাৎ, এমন ধারণা যা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক নয়, বরং ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

"সমাজ" এবং "জ্ঞাতিত্ব" – এই দুই প্রত্যয়ের অর্থ কি, এ দুয়ের আন্তঃসম্পর্ক কি – এসব হচ্ছে এই পাঠের বিষয়। সর্বপ্রথমে, কয়েকটি বিষয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এক: সমাজ এবং জ্ঞাতিত্ব, এগুলো হচ্ছে প্রত্যয়। অর্থাৎ, এমন ধারণা যা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক নয়, বরং ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ: "পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের একত্রে বসবাস"। এধরনের বাক্য বর্ণনামূলক বিবরণের অংশ। পক্ষান্তরে, "ইংল্যান্ডের শিল্পপতি শ্রেণীর গঠনকালে, বিয়ে এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক পাটাতন হয়ে ওঠে" – এই বাক্যটি বিশ্লেষণমূলক হিসেবে বিবেচিত হবে। কেন? লক্ষ্য করুন প্রথম বাক্যে কোন নির্দিষ্টতা নেই। কোন্ সমাজের কথা বলা হচ্ছে, কোন সময়কালের কথা বলা হচ্ছে, কোন্ শ্রেণী কিংবা কোন্ জাতিসত্তা, অথবা কোন্ ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, কিছুই স্পষ্ট না। অনেকে একমত হবেন যে, এটি একটি কালোত্তীর্ণ স্বর, এবং এটি (লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং ঔচিত্যবোধ ছাড়া) কিছু বুঝতে সাহায্য করে না। দ্বিতীয় যে বাক্যটি আপনি পড়লেন, সেখানে আপনি লক্ষ্য করুন, একটি প্রধান বক্তব্য হাজির করা হচ্ছে: বিয়ে এবং শ্রেণী গঠন আন্তঃসম্পর্কিত। অর্থাৎ বিয়ে শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়, বিয়ে আকাশ থেকে পড়ে না। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিয়ের বিশেষ অর্থ দাঁড়ায়। বিয়ে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার শর্তসাপেক্ষ। যে শ্রেণীর (ইংরেজ শিল্পপতি শ্রেণী) কথা বলা হচ্ছে, সেটি ছিল ক্ষমতাশালী শ্রেণী। কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের পরিসরে নয়, সমগ্র বিশ্বে এই শ্রেণীর ক্ষমতা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। তার মানে কি এই যে, বর্ণনা কাজের কিছু না? তা নয় মোটেই। বর্ণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বর্ণনার খাতিরে করা বর্ণনা নয়। দ্বিতীয় বাক্যের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে লিওনর ডেভিডফ এবং ক্যাথরিন হল বর্ণনার সাহায্য নিয়েছেন। মোট কথা, বর্ণনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকা জরুরী।

কথা হচ্ছিল, সমাজ এবং জ্ঞাতিত্ব যে প্রত্যয়, তা নিয়ে। সামাজিক বিজ্ঞানে এমন শব্দ রয়েছে যা মানুষজন প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে, যেমন: ইতিহাস, শ্রেণী, জাতীয়তাবাদ, পরিবার ইত্যাদি। এই একই শব্দগুচ্ছ আবার সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য বিশেষ অর্থ বহন করে। এগুলো সাধারণ শব্দ হিসেবে না, বরং প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সচরাচর এমনটি ঘটে না। ইলেকট্রন, প্রোটন, এটম এগুলো সাধারণত বৈজ্ঞানিক আলাপচারিতার বাইরে ব্যবহৃত হয় না (১ নং পাঠে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে)। নৃবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে, এই সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দের যে বিশেষ প্রত্যয়গত ওজন আছে, সে ব্যাপারে সতর্ক হতে শেখা জরুরী।

দুই, সমাজ এবং জ্ঞাতিত্ব – নৃবিজ্ঞানীরা এ দুই প্রত্যয়ের-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়, এ দুটি প্রত্যয়ের অর্থ সকল নৃবিজ্ঞানীর কাছে এক রকম নয়। নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেছে বিষয়গুলোকে। হয়তো বা এমনটা ঘটেছে যে,

মনে রাখবেন, নৃবিজ্ঞ
অখন্ড জ্ঞানকান্ড নয়।
সকল জ্ঞানকান্ডের ম
নৃবিজ্ঞানও বেড়ে উঠে
শক্তিশালী হয়েছে ভি
চিন্তাসূত্রে, এবং নানা
তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে
চিন্তাসূত্রে, এবং নানা
তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে

কোন একটি তাত্ত্বিক ধারা যেই বিশেষ ভাবে একটি প্রত্যয়ের অর্থ দাঁড় করিয়েছে, অন্য তাত্ত্বিক ধারা আবার সেই অর্থকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তিন, মনে রাখবেন, নৃবিজ্ঞান কোন অখন্ড জ্ঞানকান্ড নয়। অপরাপর জ্ঞানকান্ডের মতন নৃবিজ্ঞানও বেড়ে উঠেছে, শক্তিশালী হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাসূত্রে, এবং নানান ধরনের তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে।

এই পাঠের প্রথম অংশে, অতি সংক্ষেপে নৃবিজ্ঞানের (এবং সামাজিক বিজ্ঞান) কিছু কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক ধারার সাথে আপনার পরিচয় ঘটানো হবে। ধারাগুলো হলো: ১. বিবর্তনবাদ ২. মার্ক্সবাদ ৩. ক্রিয়াবাদ ৪. কাঠামোবাদ ৫. প্রতীকবাদ এবং ৬. নারীবাদ। নৃবিজ্ঞান (এবং সামাজিক বিজ্ঞান) বোঝার জন্য, ব্যবহার করার জন্য তত্ত্ব এবং প্রত্যয়ের সাথে একটি নূন্যতম পরিচয় প্রয়োজন। নিচের এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। এই পাঠের দ্বিতীয় অংশে জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা এবং জ্ঞাতিত্ব নৃবিজ্ঞানে কি গুরুত্ব বহন করে তা আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. **বিবর্তনবাদ** (Evolutionism): বিবর্তনবাদী তত্ত্ব মতে, একটি প্রজাতি অথবা একটি বিশিষ্ট জীবের জনসমষ্টি কাঠামোগতভাবে ক্রম পরিবর্তিত হয়। প্রতিবেশের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। বংশ (heredity) এবং প্রতিবেশ (ecology), কোনটার ভূমিকা কতখানি, এ নিয়ে বিবর্তনবাদে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারা রয়েছে। এসত্ত্বেও, মোটের উপর বিবর্তনবাদ ধরে নেয় যে, *প্রতিবেশের সাথে জীবের অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠা হচ্ছে বিবর্তনের সামগ্রিক ধারা।* এবং বির্বতনবাদীরা ধরে নেন, একটি নির্দিষ্ট প্রতিবেশের উপযোগী হয়ে উঠার সাথে সাথে প্রতিটি প্রজাতি অধিকতর জটিল, পৃথকীকৃত এবং বিচিত্র হয়ে উঠে। জৈবিক বিবর্তনের এই ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানে আমদানি করা হয়, ব্যবহার করা হয়। যে দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যে, সমাজ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির (যেমন পরিবার, বিবাহ) পরিবর্তন বিবর্তনের ধারণার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব, তাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন বলা হয়। (বিবর্তনের দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে ৩ নং পাঠে। দেখুন "পরিবারের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব")। উনবিংশ শতক ছিলো বিবর্তনবাদী তত্ত্বের স্বর্ণযুগ। নৃবিজ্ঞানে বিবর্তনবাদী ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন মর্গান, ম্যাকলেনান, মেইন, বাকোফেন, টায়লর, ফ্রেজার এবং আরও অনেকে।

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব মতে, একটি প্রজাতি অথবা একটি বিশিষ্ট জীবের জনসমষ্টি কাঠামোগতভাবে ক্রম পরিবর্তিত হয়।

ক্রিয়াবাদীদের দৃষ্টিতে, বিবর্তনবাদ হচ্ছে কুর্সী-কেদারায় বসে বসে করা নৃবিজ্ঞান। সকল মানব সমষ্টির ক্রম পরিবর্তনের যে ধারণা ধরে বিবর্তনবাদীরা এগোন, সেটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের যে ঐকিক ইতিহাস বিবর্তনবাদ দাঁড় করায়, তা বিভিন্ন অঞ্চলের, ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের নির্দিষ্টতাকে অস্বীকার করে। এটি হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান সমালোচনা।

২. **ক্রিয়াবাদ** (Functionalism): সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদি, সর্ম্পক এবং আচরণ সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় কি কার্য পালন করে ক্রিয়াবাদ তারই তত্ত্ব। এই তাত্ত্বিক কাঠামো বিংশ শতকের বৃটিশ নৃবিজ্ঞানের সবচাইতে শক্তিশালী ধারা ছিল। বলা হয়, বৃটিশ নৃবিজ্ঞানীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল ডুর্খাইম দ্বারা। ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব বিশেষ করে বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্- ম্যালিনোস্কির নামের সাথে যুক্ত। তিনি বিবর্তনবাদের ভাবনা চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে এই তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রবর্তন ঘটান। ম্যালিনোস্কির দৃষ্টিতে মনুষ্য প্রাণীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার যে ভূমিকা সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি পালন করে থাকে, সেটাই হচ্ছে ক্রিয়া। এবং "চাহিদা" পূরণের এই ক্রিয়াই হওয়া উচিত নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। ম্যালিনোস্কির দৃষ্টিতে চাহিদা দুই প্রকার: *মৌলিক* (দৈহিক এবং অনুভূতিমূলক) এবং *গৌণ*।

ম্যালিনোস্কির দৃষ্টিতে মনুষ্য প্রাণীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার যে ভূমিকা সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি পালন করে থাকে, সেটাই হচ্ছে ক্রিয়া।

ম্যালিনোস্কির মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ক্রিয়াবাদী চিন্তা ভাবনার নতুন নামকরণ করলেন: কাঠামোগত-ক্রিয়াবাদ। অনেকের মতে, এই নামকরণ অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের দৃষ্টিতে, *সমাজ কাঠামো হচ্ছে* সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানের সেই জাল যা সমাজের টিকে থাকা নিশ্চিত করে। অপর পক্ষে, *ক্রিয়া* বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াশীলতা। তাঁর যুক্তি ছিল এরূপ: সমাজ হচ্ছে একটি সমগ্র যা টিকে থাকে। নির্দিষ্ট কোন সমাজে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্ঞাতিত্ব, ধর্ম এগুলো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে। সমাজ এ কারণে টিকে থাকে। শুধুমাত্র টিকে থাকে বললে ভুল হবে। সমাজ, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের দৃষ্টিতে, সুসংহত এবং সুসমন্বিতভাবে বারে বারে পুর্নজন্ম লাভ করে।

ক্রিয়াবাদের প্রধান সমালোচনা হ'ল: প্রথমত, ক্রিয়া এবং কাঠামোর যে ধারণা কাঠামোগত-ক্রিয়াবাদীরা দিয়ে থাকেন সেগুলো অনৈতিহাসিক। অর্থাৎ, সমাজের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক যে রূপান্তর ঘটে থাকে তা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বোঝা সম্ভব না। দ্বিতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গি অভ্যন্তরীণ সংঘাত বা দ্বন্দ্ব – এই প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে চলে।

কাঠামোবাদের সূত্রপাত ঘটে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন হিসেবে। এই আন্দোলন প্রথমে দানা বাঁধে ভাষাতত্ত্বে ।

৩. **কাঠামোবাদ** (Structuralism): কাঠামোবাদের সূত্রপাত ঘটে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন হিসেবে। এই আন্দোলন প্রথমে দানা বাঁধে ভাষাতত্ত্বে । পরবর্তী পর্যায়ে, এই দৃষ্টিভঙ্গি নৃবিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য সমালোচনায় ছড়িয়ে পড়ে। নৃবিজ্ঞানে এর জনক ক্লদ লেভি-স্ট্রস। তাঁর দৃষ্টিতে, মনুষ্য মন ও মনুষ্য সংস্কৃতি বোঝার মডেল হচ্ছে ভাষাতত্ত্ব।

পূর্বে ভাষাতাত্ত্বিক ফার্ডিনান্দ সস্যুঘ কিছু কেন্দ্রীয় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছিলেন। সেগুলো ছিল এরূপ: প্রথমত, ভাষাকে অধ্যয়ন করতে হবে তার উৎপত্তি, তার ঐতিহাসিক বিকাশ, এভাবে নয়, বরং *একটি চিহ্ন ব্যবস্থা* (a system of signs) হিসেবে। দ্বিতীয়ত, *শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পর্কযুক্ত*। অর্থাৎ, কোন শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন ভাবে বোঝা সম্ভব নয়। "কুঁড়ে ঘর" আর "গোয়াল ঘর", দুটোই আকার আকৃতির দিক দিয়ে ছোটখাট ঘরকে বোঝায়। কিন্তু একটাতে মানুষ বসবাস করে, অপরটাতে গরু-বাছুর। যদিও দুটো শব্দই ঘরকে বোঝায়, কিন্তু এদের ব্যবহার ভিন্ন, আবার সম্পর্কযুক্ত (একটাতে মানুষ থাকে, অপরটাতে পশু)। তৃতীয়ত, *ভাষা বাস্তবতাকে গঠন করে*, বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নয়। সস্যুঘ বলছেন, মানুষের মনোজগতে যে কোন বস্তু বা ভাবনা, অর্থযুক্ত। ভাষা এই অর্থ গঠন করে, সেটিকে প্রকাশ করে। এবং এই অর্থেই, সস্যুঘের দৃষ্টিতে, ভাষার বাইরে কোন বাস্তবতা নেই। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। "মুক্তিযোদ্ধা" এবং "সন্ত্রাসবাদী" দুটি শব্দ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং তার মিত্রদের দৃষ্টিতে বর্তমানে ওসামা বিন লাদেন হচ্ছেন "সন্ত্রাসী" (বর্তমানে বলা হচ্ছে কারণ লাদেন যখন সোভিয়েত দখলের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেন তখন তিনি একই মহলের কাছে ছিলেন "মুক্তিযোদ্ধা")। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য, এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশের মানুষের কাছে লাদেন হচ্ছেন একজন "মুক্তিযোদ্ধা"। যদি আপনি বলেন, "মুক্তিযোদ্ধা না কি সন্ত্রাসী, এতসব বুঝি না। লাদেন হচ্ছেন একজন মানুষ"। আপনার মনে হতে পারে, "মানুষ" শব্দ ব্যবহার করে ভাষার অত প্যাঁচ-গোঁচ এড়ান যাবে, "মানুষ" হচ্ছে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। এখানে আবার রাজনীতি-টাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার নাই। কিন্তু সস্যুঘ অনুসারী আপনাকে বলতে পারেন, হ্যাঁ, কিন্তু, তোমার কথার প্রত্যুত্তরে তোমাকে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে বসে, যদি বলে বসে, "ও কিসের মানুষ? ও তো পশু। ১১ই সেপ্টেম্বর এতগুলো মানুষকে হত্যা করল..." অর্থাৎ, বর্গ ("মানুষ", "পশু") বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। (লাদেনকে যিনি পশু ডেকেছেন, তার প্রত্যুত্তরে আপনি অবশ্য বলতে পারেন, "হ্যাঁ, কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের ধ্বংসযজ্ঞ লাদেনই ঘটিয়েছিল তার প্রমাণ কই?" – এগুলো অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ)।

সস্যুঘ অনুসরণে লেভি-স্ট্রসের বক্তব্য ছিল, কাঠামোবাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মনোজগত কিভাবে কাজ করে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটিকে বোঝা। লেভি-স্ট্রসের পূর্বানুমান হচ্ছেঃ মনুষ্য প্রজাতি মাত্রই অভিজ্ঞতাকে সাজায়, সেটির শ্রেণীকরণ করে। মানুষের মনোজগতের এই কাঠামো এবং এই প্রবৃত্তি সর্বজনীন। তার কারণ হচ্ছে, এই কাজটি করে থাকে মগজ এবং সকল মানুষের মগজ একই ধরনের । মগজের *উপরের স্তরের প্রকাশভঙ্গি* ভিন্ন, এবং সেটি সাংস্কৃতিক। অর্থাৎ, এক সংস্কৃতি হতে আরেক সংস্কৃতির প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু *ভিত্তিস্বরূপ বিন্যস্ত মূলনীতি* (underlying ordering principles) একই। অর্থাৎ, এটি বিশ্বব্যাপী। কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে *"বিপরীত জোড়"*-এর (binary opposition) ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ কোন প্রত্যয়কে বোঝে নেতির মাধ্যমে। "দিন"এর অর্থ আমরা তখনই বুঝি যখন মনে মনে হলেও তুলনা করি "রাত"এর সাথে। যদি আলোর ধারণা না থাকে "আধাঁর"এর অর্থ দাঁড়ায় না যেহেতু আধাঁরের মানে হচ্ছে আলোহীনতা; একইভাবে, "মৃত্যু" মানেই "প্রাণ"হীনতা। লেভি-স্ট্রসের মতে, কিছু বিপরীত জোড় বিশ্বব্যাপী যেমন, ডান-বাম, কাঁচা-রন্ধনকৃত, সংস্কৃতি-প্রকৃতি, কেন্দ্র-প্রান্ত এবং পুরুষ-নারী।

লেভি-স্ট্রসের বক্তব্য ছিল, কাঠামোবাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মনোজগত কিভাবে কাজ করে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিশে- ষণের মাধ্যমে তা

কাঠামোবাদের সমালোচকরা বলেন, এই তত্ত্ব নিশ্চল এবং অনৈতিহাসিক। বিষয়টিকে তাঁরা এই ভাবে ব্যাখ্যা করেনঃ সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের যে ভূমিকা, কাঠামোবাদ সেটাকে গুরুত্ব দেয় না। মনে হবে, মানুষ কাঠামো দ্বারা পরিচালিত। উপরন্তু, কাঠামোবাদী তত্ত্বে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ব্যবস্থার রূপান্তর ক্ষমতা (সামন্তবাদ হতে পুঁজিবাদে রূপান্তর), এর গতিময়তা, এসব বিষয় উপেক্ষিত।

৪. **<u>মার্ক্সবাদ</u>** (Marxism)ঃ তাত্ত্বিক অর্থে মার্ক্সবাদ হচ্ছে, কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) রচনাসমগ্র, এবং তার উপর ভিত্তি করে নিরন্তর রচিত হতে থাকা নানান মার্ক্সবাদীদের লেখালেখি। রাজনৈতিক অর্থে মার্ক্সবাদ হচ্ছে, সর্বহারার বৈপ্লবিক সংগ্রাম, যে সংগ্রাম পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাবে। বর্তমান আলোচনার সুবিধার্থে মার্ক্সবাদ বলতে আমরা বুঝব: (ক) একটি *দর্শন* যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিদ্যমান মানব সমাজ, এবং ভবিষ্যতের মানব সমাজ (কি হওয়া উচিত) (খ) একটি *তত্ত্ব সমগ্র* যার বিষয় বস্তু হচ্ছে সমাজের স্বরূপ এবং (গ) বিশ্লেষণ করার, ও সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর একটি *পদ্ধতি*। আধুনিক বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, যথা, শিল্প-পুঁজিবাদের উৎপত্তি এবং সম্প্রসারণ ছিল মার্ক্সের প্রধান কাজের জায়গা। এই মনোযোগের ফলাফল হচ্ছে তাঁর রচিত তিন খন্ডের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ।

মার্ক্সবাদ বলতে আমরা বুঝব: (ক) একটি দর্শন যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিদ্যমান মানব সমাজ, এবং ভবিষ্যতের মানব সমাজ (কি হওয়া উচিত) (খ) একটি তত্ত্ব সমগ্র যার বিষয় বস্তু হচ্ছে সমাজের স্বরূপ এবং (গ) বিশ্লেষণ করার, ও সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর একটি পদ্ধতি।

সামাজিক ব্যবস্থা, মার্ক্সের মতে, নিয়মানুসারে প্রবর্তিত হয়, পরিবর্তিত হয়। মানুষ অন্য প্রজাতি হতে এই অর্থে ভিন্ন যে, কেবলমাত্র মানুষই তার আহার্য উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণ মানব ইতিহাসের এক পর্যায়ে দ্বন্দ্বের সহৃত্রপাত ঘটায়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, যে দল সম্পদের (উৎপাদনের উপায়) উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে, সেই দল হয়ে উঠে সমাজের *শাসক শ্রেণী*। উৎপাদনের উপায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের *অন্যান্য শ্রেণী* গড়ে উঠে। উৎপাদনের উপায় কি? মার্ক্সের দৃষ্টিতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সকল উপাদানই হচ্ছে *উৎপাদনের উপায়* (means of production)। যথাঃ ভূমি, কাঁচা মাল, প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি। সমাজের সকল মানুষের উৎপাদনের উপায়ের উপর ক্ষমতা একই রকম না – কেউ বা ভূমির মালিক, কেউ মালিক না, শুধুমাত্র বর্গাদার। কেউ আবার কৃষিজমিতে মজুরি খাটেন। উৎপাদনের উপায়কে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তা হচ্ছে উৎপাদনের সম্পর্ক (ভূমি-মালিক, কৃষি-মজুরঃ relations of production)। ভিন্নতর এই ক্ষমতা সমাজে *শ্রেণী সম্পর্কের ক্ষমতা* তৈরী করে। উৎপাদনের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক স্ফসটি সমাজের কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা পরিসরে ধরুন, কেবলমাত্র অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি হয়ে উঠে সমাজের সামগ্রিক চেহারা। সংক্ষেপে, এই হচ্ছে "ইতিহাসের বস্তুগত তত্ত্ব"। এই তত্ত্ব অনুসারে,

সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়, তার কারণ এটি হচ্ছে *ভিত্তি* (base)। উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে রূপদান করে; যেহেতু এই ব্যবস্থাগুলো উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত. সেকারণে এগুলো হচ্ছে *উপরিকাঠামো* (superstructure)।

মানব ইতিহাসকে মার্ক্স কিছু ক্রমান্বয়িক পর্বে ভাগ করেন: আদি সাম্যবাদ বা উপজাতি ভিত্তিক সংগঠন, দাসত্ব, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ। জীবনের শেষ দিকে, তিনি সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজটিকে আরও পেছনের দিকে ঠেলে দেন। আদি অর্থনৈতিক সমাজের অনুসন্ধান সূত্রে তাঁর পরিচয় ঘটে নৃবিজ্ঞানের সাথে। লুইস হেনরী মর্গানের যুগ বিভাগ তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বই লেখার কাজে হাত দেন। বই পরিকল্পনারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে; এঙ্গেলস মার্ক্সের রেখে যাওয়া নথি পত্রের সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করেন (*পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*, ১৮৮৪)।

ইউরোপীয় আলোকময়তার দার্শনিকদের মতন মার্ক্সও ভাবতেন, মানব সমাজ অধিকতর প্রগতির ধারায় বিকশিত হচ্ছে, পরিবর্তন ঘটছে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামন্তবাদের তুলনায় পুঁজিবাদে মুক্তির সম্ভাবনা অধিকতর। কিন্তু প্রগতির এই যাত্রা শান্তিপূর্ণ বা সংঘাতহীন নয়; বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ক্ষমতার লড়াইয়ের ফসল। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে, ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সেই অর্থে, মার্ক্সীয় ইতিহাসের ধারণা প্রথাগত ইতিহাসের ধারণা (এক রাজবংশের বদলে আরেক রাজবংশ, কিংবা ধীরে ধীরে জাতিসত্তা অর্জন অথবা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা) থেকে ভিন্ন। শ্রেণী ইতিহাসের চাবিকাঠি হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুবিধাদি অর্জনের লড়াই ও সংগ্রাম।

সাম্প্রতিককালে, ১৯৬০'র দশক হতে, নৃবিজ্ঞানে মার্ক্সবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ই টেরে, এম গদলেয়ার, এরিক উলফ, পিটার উর্সলি প্রমুখদের কাজের মাধ্যমে।

৫. <u>**প্রতীকবাদ**</u> (Symbolism): প্রতীকের অর্থ অনুসন্ধান নানাবিধ নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহ এবং চিন্তাভাবনাকে এক জায়গায় জড়ো করতে সক্ষম হয়। যেমন লেভি-স্ট্রস, ডেভিড শ্নাইডার, ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ, ভিক্টর টার্নার, মেরি ডাগলাস ইত্যাদি। এদের মাঝে কিছু তাত্ত্বিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সমিলের একটি কেন্দ্রীয় জায়গা আছে এবং তা হচ্ছে: অর্থ এবং যোগাযোগের অনুসন্ধান। প্রতীক বলতে বোঝায় এমন কিছু যা অন্য কিছুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরুন, বাংলাদেশের পতাকা হচ্ছে এই দেশের সার্বভৌমত্বের একটি প্রতীক। অথবা, শহীদ মিনার হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের প্রতীক। এই ধারা, ষাটের দশকের শেষভাগ হতে সত্তরের দশকে, নৃবিজ্ঞানে শক্তিশালী হয়ে উঠে। প্রতীকী নৃবিজ্ঞান সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে অর্থ ব্যবস্থা হিসেবে। প্রতীকবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই অর্থ ব্যবস্থাকে নৃবিজ্ঞানী উদঘাটন করেন আচারাদি (rituals) এবং প্রতীক/চিহ্ন ব্যাখ্যাদানের সাহায্যে।

প্রতীকবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই অর্থ ব্যবস্থাকে নৃবিজ্ঞানী উদঘাটন করেন আচারাদি (rituals) এবং প্রতীক/চিহ্ন ব্যাখ্যাদানের সাহায্যে।

প্রতীকী নৃবিজ্ঞান বা প্রতীকবাদ চারটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে: <u>প্রথমত</u>, প্রতীকবাদ সামাজিক কার্যকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না। মনে হবে মানুষজনের কার্যকলাপ প্রতীক এবং অর্থ তৈরী দ্বারা পরিচালিত। <u>দ্বিতীয়ত</u>, এই তত্ত্ব সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে না। <u>তৃতীয়</u> সমালোচনার জায়গা তৈরী করে দিয়েছেন নারীবাদীরা। তাদের বক্তব্য হ'ল, প্রতীকের অর্থ সকলের জন্য এক রকম নয়। ধরুন, চাঁদ-তারা। এই দেশের কিছু মানুষের জন্য এটি ইসলামী ঐক্যের প্রতীক। আবার অনেক মানুষের কাছে এটি পাকিস্তানী শাসনামল ও পাকিস্তান সরকারের বাঙ্গালিদের উপর নিপীড়নের প্রতীক। একই দেশের মানুষজনের মধ্যেকার এই বিভাজনগুলো বাস্তব। তাহলে আমরা কিভাবে ধরে নিতে পারি যে সংস্কৃতি একটি অখন্ড অর্থ ব্যবস্থা, প্রতীকের সমষ্টি, যার অর্থ সকলের জন্য একই রকম?

৬. <u>নারীবাদ</u> (Feminism)ঃ নারীবাদ মার্ক্সবাদের মতনই। শুধু মাত্র তত্ত্ব নয়, সমাজে বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটানোর আন্দোলন বা সংগ্রাম এর অবিচ্ছিন্ন দিক। নারীবাদের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবনা হচ্ছেঃ নারী নিপীড়িত, নারী নিপীড়নের অপর দিক হচ্ছে পুরুষ আধিপত্য। নারীবাদের মধ্যে ভিন্ন পজিশন থাকা সত্ত্বেও সকলে কিছূ বিষয়ে একমত হবেন। যথা, নারী অধীনস্ততা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বা ঈশ্বর প্রদত্ত নয়। এটা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক। পুরুষ আধিপত্যও তাইঃ নির্দিষ্ট ক্ষমতা কাঠামো দ্বারা সৃষ্ট, যার কারণে পুরুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিধাদি ভোগ করে। নারীবাদীদের মধ্যকার কেন্দ্রীয় বিভাজন নারীর অবস্থার বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে, কিভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব, কি ধরনের পরিবর্তন কাম্য – এসব কে কেন্দ্র করে।

নারীবাদের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবনা হচ্ছেঃ নারী নিপীড়িত, নারী নিপীড়নের অপর দিক হচ্ছে পুরুষ আধিপত্য।

উদারনৈতিক নারীবাদীদের মতে, ব্যক্তি হিসেবে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন আইনী সংস্কারের উপর। তাঁদের বক্তব্য হলঃ বলা হয়ে থাকে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। কিন্তু নারীবাদী গবেষণা সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করে কিভাবে পুরুষের ক্ষমতা বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। উদারনৈতিক নারীবাদীরা গুরুত্ব দেন এধরনের বিষয়ের উপরঃ নারী ও পুরুষের মজুরির হার একই হওয়া উচিত, চাকরির একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত ইত্যাদি। *সমাজতান্ত্রিক/মার্ক্সবাদী* নারীবাদীদের মতে, লিঙ্গীয় বৈষম্য শ্রেণী বৈষম্যের মতনই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত মার্ক্সবাদীদের ধারণা হচ্ছে, ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থা ভেঙে ফেললে নারী নিপীড়ন আর থাকবে না। তাঁদের দৃষ্টিতে, ব্যক্তি মালিকানা কেবলমাত্র শ্রেণী শাসন নয়, নারী নিপীড়নেরও কারণ। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, বিত্তহীন শ্রেণী, যাদের কিনা সম্পত্তি নাই, সেই শ্রেণীর নারী পুরুষের সম্পর্কও বৈষম্যপূর্ণ। পুরুষ আধিপত্য ও শ্রেণী আধিপত্যকে আলাদা ভাবে বুঝতে হবে, এ দুই আধিপত্য কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা নিরিখ করে দেখতে হবে।

সাম্প্রতিককালে, এই দুই ধরনের নারীবাদ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের/কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদীদের দ্বারা। এঁরা বর্ণবাদের বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন। এঁদের বক্তব্য হচ্ছেঃ বিদ্যমান নারীবাদী তত্ত্বে পুরুষ আধিপত্য কেন্দ্রীয়। উদারনৈতিক নারীবাদে শ্রেণী বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, যা কিনা সমাজতন্ত্রী নারীবাদীরা করেন। কিন্তু বর্ণ বৈষম্যের প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। সমাজে একাধিক কেন্দ্রীয় বিভাজন উপস্থিতঃ শুধুমাত্র লিঙ্গীয় এবং শ্রেণী বৈষম্য নয়, নরবর্ণ ভিত্তিক (race) বৈষম্য একইভাবে কেন্দ্রীয়। এই বৈষম্যের মুখোমুখি না হলে নারীর মধ্যকার বিভেদ এবং কি ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংহতি রচনা করা সম্ভব – এগুলোর পথ খোঁজা দুরূহ হয়ে পড়বে।

উপরে নৃবিজ্ঞানের কিছু প্রধান তাত্ত্বিক ধারার সাথে – বিবর্তনবাদ, মার্ক্সবাদ, ক্রিয়াবাদ, কাঠামোবাদ, প্রতীকবাদ এবং নারীবাদ – আপনার পরিচয় ঘটানো হয়েছে। গত দুই দশকে কেবল নৃবিজ্ঞান নয়, সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিষয়ের (সাহিত্য অধ্যয়ন, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি) তত্ত্ব জগতে তোলপাড় ঘটেছে উত্তর-কাঠামোবাদ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ নামক তত্ত্বীয় উদ্ভাবনের কারণে। দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক দিয়ে, এই তত্ত্বগুলোর মধ্যে কিছু সামিল রয়েছে। স্থানের অভাবে এগুলোর সাথে আপনাদের পরিচয় ঘটানো সম্ভব নয়। এ বাদে, একই সময়কালে সংস্কৃতি তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদ উত্থাপন করেছেন প্রাচ্যবাদের (orientalism) ধারণা। প্রাচ্যবাদ হচ্ছে প্রাচ্য সংক্রান্ত অধ্যয়ন। প্রাচ্যবাদ হচ্ছে পাশ্চাত্যের উৎপাদিত প্রাচ্য সম্বন্ধে একটি জ্ঞানব্যবস্থা। শুধুমাত্র বিদ্যাজাগতিক লেখালেখি নয়, প্রাচ্য সম্বন্ধে "জ্ঞান" তৈরি হয়েছে নানাভাবেঃ ভ্রমণ কাহিনী, সাহিত্য, উপন্যাস, সরকারী কর্মকর্তাদের বিবরণ, চিঠিপত্র ইত্যাদি। সাঈদ বলেন, প্রাচ্যবাদ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রপঞ্চ। এটি অনড়, অটল নয়; সহজ-সরলও নয়। প্রাচ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ধরে যে জ্ঞান পাশ্চাত্য উৎপাদন করেছে তা নিরিখ করলে বোঝা যায় যে, এই জ্ঞানব্যবস্থা নিরপেক্ষ নয়। এই জ্ঞান

পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যের স্মারক। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি থেকে এই জ্ঞানব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অযৌক্তিক।

প্রাচ্যবাদ হচ্ছে প্রাচ্য সংক্রান্ত অধ্যয়ন; প্রাচ্যবাদ হচ্ছে পাশ্চাত্যের উৎপাদিত প্রাচ্য সম্বন্ধে একটি জ্ঞান ব্যবস্থা।

যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো উপরে উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যকার ফারাক অনেক। কি ধরনের? যেমন ধরুন, কিছু নৃবিজ্ঞানী উপরে আলোচিত তত্ত্বগুলোকে দুইভাগে ভাগ করবেন: (ক) মার্ক্সবাদী (এতে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করবেন তাঁরা) এবং (খ) অ-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব। খোদ মার্ক্সের ভাষায় বললে, এই ফারাকের কেন্দ্রীয় দিক হচ্ছে, অন্য সকল দর্শন জগতকে বুঝতে চায়, পক্ষান্তরে, মার্ক্সবাদ জগতকে পরিবর্তন করতে চায় (তবে, মনে রাখবেন, মার্ক্স নিজে কখনও "মার্ক্সবাদ" শব্দটি উচ্চারণ করেননি)। মার্ক্সবাদী তত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সংঘাতের উপর। তার বিপরীতধর্মী তত্ত্ব, উদাহরণস্বরূপ ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে, গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ভারসাম্যের উপর, সামাজিক স্থিতিশীলতার উপর। মার্ক্সবাদে শোষণ এবং শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়া, বিপ- ব এবং মানব মুক্তির পক্ষে লড়াই করা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো মার্ক্সবাদের কেন্দ্রে, এই বিষয়গুলো মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক। পক্ষান্তরে, আপনারা উপরের আলোচনায় দেখেছেন যে, সমালোচকদের মতে, অ-মার্ক্সবাদী তত্ত্বের একটি প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে সেগুলো মূলত অনৈতিহাসিক। তবে, এক্ষেত্রে উল্লেখ করা জরুরী যে, বর্তমানের বহু মার্ক্সীয় নৃবিজ্ঞানীদের মতে, লুইস হেনরী মর্গানের বিবর্তনবাদী পরিকাঠামো গ্রহণ করার কারণে খোদ মার্ক্স এবং এঙ্গেলস তাঁদের উদ্ভাবিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে সরে যান। মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের সমাজের ক্রম বিকাশের পর্ব, স্টালিনীয় যুগে[১] একটি যান্ত্রিক ফর্মুলায় পর্যবসিত হয়। পৃথিবীর বিবিধ ইতিহাস কিছু অনড় পর্বে বন্দীকৃত হয়ে পড়ে।

জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা ও নৃবিজ্ঞানে জ্ঞাতিত্বের গুরুত্ব

জ্ঞাতিত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক সত্যের সামাজিক কিংবা প্রাকৃতিক নির্মান

জ্ঞাতিত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবেঃ জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক সত্যের সামাজিক কিংবা প্রাকৃতিক নির্মাণ। এই অর্থে, জ্ঞাতিত্ব একইসাথে প্রাকৃতিক বা জৈবিক, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। গোড়াপত্তন থেকে বর্তমানকাল, এই দেড়শত বছরের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ভিত্তি ছিল কিছু শক্তিশালী পূর্বানুমান। প্রথমত, ধরে নেয়া হয়েছিল *জ্ঞাতিত্ব সকল সমাজে বিভাজন তৈরী করে*ঃ কারা রক্ত (অথবা, কোন কোন সমাজে জ্ঞাতিবন্ধনের ভিত্তি হচ্ছে হাড়, আর কোথাও বীর্য) সূত্রে জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ এবং কারা জ্ঞাতিকুল না, এটা একটি কেন্দ্রীয় বিভাজন। দ্বিতীয়ত, ধরে নেয়া হয়েছিলো, *এই বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে জন্মদান সংক্রান্ত প্রাকৃতিক বিষয়াবলী*। প্রজনন (procreation) এবং রক্ত সম্পর্ক (blood-relatedness) – এগুলো হচ্ছে মৌলিক সত্য কারণ এগুলো প্রাকৃতিক (অপরিবর্তনীয়, অনড়, অটল অর্থে) এবং বিশ্বজনীন (সময়কাল এবং স্থানিক ভিন্নতার উর্ধ্বে)। এ দুটি কেন্দ্রীয় পূর্বানুমান তৈরী করে দেয় তৃতীয় পূর্বানুমানঃ জৈবিকতা হচ্ছে জীববিজ্ঞানীদের কার্যক্ষেত্র, *নৃবিজ্ঞানীদের কার্যক্ষেত্র হচ্ছে জৈবিকতার সাংস্কৃতিক নির্মাণ*। নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নৃবিজ্ঞানীদের জন্য কেন্দ্রীয়, কিন্তু এগুলো জৈবিক সম্পর্ক হতে উদ্ভূত, জৈবিকতার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নির্মাণ এক সমাজ হতে আরেক সমাজে ভিন্ন হতে পারে, উদাহরণস্বরূপঃ মান্দাই সমাজ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক, পক্ষান্তরে চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক; আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে জমি বাপ-চাচাদের সাথে চাষ করা হয়, আবার কোথাও কোথাও মামাদের সাথে; বাঙ্গালী মুসলমানেরা যাকে "ফুপু" ডাকেন, বাঙ্গালী হিন্দুরা তাকে ডাকেন "পিসী" ইত্যাদি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। কেন্দ্রীয় হবার কারণ হিসেবে সাধারণত যে বিষয়গুলো নৃবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন, তা হ'লঃ জ্ঞাতিত্বের সামাজিক এবং

[১] স্টালিনীয় যুগ বলতে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে স্টালিনের শাসনকাল (১৯২০'র শেষ হতে ১৯৫০র শুরু) বোঝায়।

সাংস্কৃতিক অর্থ কেবলমাত্র নৃবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করেন, এ বিষয়ে কেবলমাত্র তাঁরা গবেষণা চালান, লেখালেখি করেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান কেবলমাত্র নৃবিজ্ঞানীদেরই আছে, সে কারণে এটা একান্তভাবে নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ইত্যাদি। সাম্প্রতিক কালে এধরনের কথাবার্তা আরও তলিয়ে দেখা হচ্ছে। নৃবিজ্ঞানে জ্ঞাতিত্বের কেন্দ্রিকতা ও গুরুত্বের ভিন্নতর ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন কিছু নৃবিজ্ঞানী। সেটি এরকম: পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় বিশ্বের সকল সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত: "আদিম" এবং "সভ্য"। সমাজের এই বিভাজন পাশ্চাত্য ইতিহাসে কয়েকশত বছর পুরোনো। পাশ্চাত্যীয় ধ্যান-ধারণায় এটি প্রতিষ্ঠিত যে, আদিম সমাজ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, সভ্য সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে আদিম এবং সভ্যের এই বিভাজন শুধুমাত্র বিশ্বের সকল সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেনি, জ্ঞানজগতের একটি শ্রম বিভাজনকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। নৃবিজ্ঞান (এবং নৃবিজ্ঞানীদের) ক্ষেত্র হচ্ছে সরল, জ্ঞাতি ভিত্তিক, রাষ্ট্রবিহীন সমাজ যেখানে আছে উপহার অর্থনীতি, পক্ষান্তরে সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে আধুনিক, শিল্প ভিত্তিক এবং (উৎপত্তি অর্থে) পাশ্চাত্য সমাজ।

নৃবিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের সময়ে, যখন কিনা "আদিম সমাজ" বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃত হয়, সেই একই সময়কালে "সমাজ" মানেই "জ্ঞাতিত্ব", এই প্রত্যয়গত সমীকরণও ঘটে। এবং এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে আদিম সমাজের গঠনমূলক একক হচ্ছে জ্ঞাতিত্ব। ক্ষুদ্র পরিসরে আদিম সমাজ কিভাবে সংগঠিত, কিভাবে কাজ করে – এগুলো বোঝার জন্য জ্ঞাতিত্ব অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, পাশ্চাত্য মানসে আদিম সমাজ নামক যে বর্গ ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠে, একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এই বর্গকে জ্ঞানজাগতিক বৈধতা দান করে। আদিম সমাজ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নৃবিজ্ঞানীরা আদিম সমাজের কিছু মূলনীতি দাঁড় করান, যেটির মধ্যে কেন্দ্রীয় হচ্ছে জ্ঞাতিত্ব। যেমন ধরুন নৃবিজ্ঞানী ফোর্টসের এই কথাগুলো: আদিম সমাজের সামাজিক জীবনের সাংগঠনিক মূলনীতি হচ্ছে জ্ঞাতিত্ব, এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য। আদিম সমাজে "সমাজ" মানেই জ্ঞাতিত্ব – এই ধারণার ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেন, এবং বিভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করান। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বংশধারা তত্ত্ব: সামাজিক দল গঠনের ভিত্তি হচ্ছে বংশধারা। এই দলগুলো বহির্বিবাহ নীতি অনুসরণ করে, কন্যা বিনিময়ের ভিত্তিতে দুই দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। নৃবিজ্ঞানীরা আরও ধরে নেন যে, জ্ঞাতি পদাবলী সামাজিক সংগঠন প্রকাশ করে। জ্ঞাতি ভিত্তিক আদিম সমাজের যে সামাজিক ব্যবস্থা, সেটি, নৃবিজ্ঞানীদের মতে, পাশ্চাত্য সমাজ হতে খুব ভিন্ন। আদিম বা অপাশ্চাত্য সমাজে জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠন যে ভূমিকা পালন করে, সেই ভূমিকা পাশ্চাত্য সমাজে পালন করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র।

নৃবিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের সময়ে, যখন কিনা "আদিম সমাজ" বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃত হয়, সেই একই সময়কালে "সমাজ" মানেই "জ্ঞাতিত্ব", এই প্রত্যয়গত সমীকরণও ঘটে।

গত দুই দশক ধরে, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের পূর্বানুমান, এবং আরও মৌলিক বিষয় যেমন "আদিম" ও "সভ্যতার" পাশ্চাত্যীয় বিভাজন নিয়ে, তীব্র সমালোচনা উচ্চারিত হচ্ছে। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের যেই পাঠ এই পুস্তকের তিনটি ইউনিটে লিখিত হয়েছে, সেখানে দুই ধরনের কাজই উপস্থাপন করা হচ্ছে। গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে একশত বছরের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন এবং হাল আমলের চিন্তাভাবনা যা ভিন্নধরনের কাজের সূত্রপাত ঘটাচ্ছে। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের শিক্ষার্থী হিসেবে দু' ধরনের কাজের সাথেই আপনার পরিচিত হওয়া সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। চতুর্থ ইউনিটের শেষতম পাঠে জ্ঞাতিত্বের যে মূল সংজ্ঞা – জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক সত্যের সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক নির্মাণ – তার প্রত্যয়গত পূর্বানুমান তুলে ধরা হবে।

সারাংশ

এই পাঠে কেন্দ্রীয় কিছু তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে – বিবর্তনবাদ, মার্ক্সবাদ, ক্রিয়াবাদ, কাঠামোবাদ এবং নারীবাদ – আপনার পরিচয় ঘটানো হয়েছে। নৃবিজ্ঞান (এবং সামাজিক বিজ্ঞান) বোঝার জন্য, ব্যবহার করার জন্য সংক্ষিপ্ত রূপে হলেও, এই তাত্ত্বিক এবং প্রত্যয়গত পরিচয় জরুরী। সাম্প্রতিককালে এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যবাদের ধারণা সামাজিক এবং মানবিক শাখার বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বর্তমানের অনেক চিন্তাবিদের উপলব্ধি হচ্ছে যে, এ পর্যন্ত যে প্রত্যয় বা তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলো সর্বজনীন ঘটনাবলী ব্যাখ্যাদানের দাবি করে। কিন্তু ভালভাবে নিরিখ করলে দেখা যায় যে, এই তত্ত্ব এবং প্রত্যয়গুলোর ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা সীমিত। এগুলো বিশ্বের বৈচিত্র্য এবং বিবিধতাকে বুঝতে বা অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে না। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এগুলো পাশ্চাত্য সমাজের প্রচলন ও অনুশীলনকে মানদন্ড হিসেবে দাঁড় করায়। এ সকল কারণে বর্তমানে অনেকে ঝুঁকে পড়েছেন প্রত্যয় বা তত্ত্ব বা জ্ঞানের ইতিহাস এবং এর পক্ষপাতিত্ব অনুসন্ধানে। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের গুরুত্ব ঠিক একইভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। ‘বিবর্তনবাদ হচ্ছে কুর্সী - কেদারায় বসে বসে করা নৃবিজ্ঞান’ - উক্তিটি কাদের ?

ক. কাঠামোবাদীদের   খ. মার্ক্সবাদীদের
গ. ক্রিয়াবাদীদের   ঘ. নারীবাদীদের

২। নৃবিজ্ঞানে কাঠামোবাদের জনক কে ?

ক. লুইস হেনরী মর্গান   খ. ক্লদ লেভি-স্ট্রস
গ. ফার্ডিনান্দ সস্যুঘ   ঘ. হেনরী মেইন

৩। ‘সংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা’ - উক্তিটি কাদের ?

ক. প্রতীকবাদী নৃবিজ্ঞানীদের   খ. নারীবাদীদের
গ. মার্ক্সবাদীদের   ঘ. কাঠামোবাদীদের

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জ্ঞাতিত্বের সংজ্ঞা কী?
২। প্রাচ্যবাদ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এই পাঠে আলোচিত প্রতিটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিন। কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আপনার কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এবং কেন, সেটির তুলনামূলক আলোচনা করুন।
২। নৃবিজ্ঞানীরা জ্ঞাতিত্বকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন? দীর্ঘ সময়ের জন্য নৃবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে “সমাজ” মানেই “জ্ঞাতিত্ব”। কেন?

জ্ঞাতিত্ব পদাবলী
Kinship Terminology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতি ও জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার ধরন
- নৃবিজ্ঞানে জ্ঞাতিত্ব কিভাবে নকশা আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে
- "প্রজাপতি সংগ্রহ" ঢং-এর জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের সমালোচনা
- জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের নতুন মোড়: "ভগ্নাংশ হতে সামগ্রিক"

নৃবিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের সময়কালের নৃবিজ্ঞানীদের, ধারণা ছিল "অনুন্নত" মানুষজনের সামাজিক আচরণ বুঝতে হলে জ্ঞাতিভিত্তিক সম্পর্ক বুঝতে হবে। তাঁদের মতে, প্রতিটি সমাজে জ্ঞাতিকুলকে বিশেষভাবে ভাগ বা শ্রেণীকরণ করা হয়; জ্ঞাতিপদ এই শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা বুঝতে সাহায্য করে। এক বা একাধিক শব্দের সাহায্যে জ্ঞাতিপদ গঠিত; এই জ্ঞাতিপদ জ্ঞাতি অবস্থান বা মর্যাদার প্রতীক। একটি সমাজের সকল জ্ঞাতিপদ মিলে তৈরী হয় সেই সমাজের জ্ঞাতিভিত্তিক পদাবলী ব্যবস্থা।

প্রাথমিককালের নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল: ঐতিহ্যবাহী সমাজে, মানুষজনের সামাজিক মর্যাদা পাশ্চাত্য মানুষজনের মত অর্জিত না, বরং জন্ম-সূত্রে আরোপিত। অপাশ্চাত্য সমাজের সামাজিক সংগঠনের মূলে রয়েছে জ্ঞাতিসম্পর্ক – এটা তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণ করে দিচ্ছে একজনের সামাজিক মর্যাদা, তার আত্মমর্যাদা বোধ; নির্ধারণ করে দিচ্ছে একজনের প্রতি অপরের কাঙ্ক্ষিত আচরণ, এবং অপরের প্রতি সেই মানুষটির আচরণবিধি। তাঁদের দৃষ্টিতে, পৃথিবীর "আদিম", "বর্বর" (হাল-আমলের ভাষায়, "অনুন্নত") সমাজে কি কি ভিত্তিতে জ্ঞাতি শ্রেণীকরণ করা হয়ে থাকে, সেটা অনুসন্ধান করা একান্ত জরুরী। তাঁরা বুঝতে চাইছিলেন জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতি।

প্রাথমিককালের নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল: ... অপাশ্চাত্য সমাজের সামাজিক সংগঠনের মূলে রয়েছে জ্ঞাতি সম্পর্ক সামাজিক সংগঠনের মূলে রয়েছে জ্ঞাতিসম্পর্ক ।

জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের এই প্রবল ধারার বিরুদ্ধে সমালোচনা তৈরী হয় ১৯৬০-এর দশক হতে। প্রধান সমালোচক ছিলেন এডমান্ড লীচ, ডেভিড শ্নাইডার এবং রবিন ফক্স। লীচ বলেন, জ্ঞাতি-ভিত্তিক সম্পর্ককে নানাভাবে, বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাজনের আদৌ কোন "সামাজিক গুরুত্ব" আছে কিনা তা অস্পষ্ট। নৃবিজ্ঞানীদের এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ (জ্ঞাতি পদের শ্রেণীকরণ, জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে দুটি বিরুদ্ধ জ্ঞাতিব্যবস্থা চিহ্নিত করা, যেমন ধরুন, মাতৃসূত্রীয় এবং পিতৃসূত্রীয় সমাজ) সামাজিক কাঠামো বুঝতে সাহায্য করে না। এ ধরনের জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নকে লীচ তুলনা করেন "প্রজাপতি" সংগ্রহের সাথে। লীচের বক্তব্য ছিল, বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি সংগ্রহ করে সেগুলোকে নানাভাবে শ্রেণীকরণ করা সম্ভব (রং, আকার ইত্যাদি) কিন্তু এটি আমাদের প্রজাপতির গঠন বুঝতে বিন্দুমাত্র সহায়তা করে না। জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নকারীরা বিষয়টিকে বিশ্লেষণের একটি পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, এবং তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় না যে এই ক্ষেত্র অপরাপর ক্ষেত্র, যেমন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম – এগুলোর সাথে কোনভাবে সম্পর্কিত। এই জোরালো সমালোচনার পর থেকে, এবং বিশেষ করে ডেভিড শ্নাইডারের মার্কিনী জ্ঞাতিত্ব নিয়ে গবেষণা কাজটি প্রকাশিত হবার পর থেকে, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে বড়সড় রদবদল ঘটে। এই রদবদলকে বর্ণনা করা হয়েছে, "ভগ্নাংশ থেকে সামগ্রিক"এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হিসেবে। জ্ঞাতিত্বকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা হ'ল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিসরের অংশ হিসেবে ("an aspect of more inclusive social and cultural

domains")| জ্ঞাতিত্বের এই পুনর্সংজ্ঞায়ন জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নকে পুনর্গঠিত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

এই পাঠটি প্রজাপতি সংগ্রহ ঢং-এর জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের নমুনা। এতে আছে দুটি প্রধান অংশ। প্রথমত, জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতির আলোচনা, এবং দ্বিতীয়ত, জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের এই ঢং-এর সাথে আপনার পরিচিত ঘটানো এবং এর "সম্ভাব্য অর্থহীনতা"র সমালোচনাটি আপনার কাছে স্পষ্ট করা। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা না হলে সাম্প্রতিক জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ধারা বোঝা সম্ভব হবে না। তবে, এটা যোগ করা জরুরী যে, প্রজাপতি সংগ্রহ ঢং-এর আরো নমুনা সামনের পাঠগুলোতে পাবেন। এই ধারা এত দীর্ঘকাল ধরে চর্চিত ছিল এবং এতই শক্তিশালী ছিল (এবং কিছু-কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং নৃবৈজ্ঞানিক মহলে, এখনও আছে) যে এটাকে বাদ দেয়া জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের ইতিহাসকে অস্বীকার করার সামিল। উপরন্তু, এই ইতিহাস জানা জরুরী কারণ এই প্রেক্ষিত থেকেই সৃষ্ট হয়েছে নতুন ধারার কাজ।

জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতি (Principles for Classifying Kin)

প্রাথমিককালের নৃবিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন:

জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতি হচ্ছে: প্রজন্ম আপেক্ষিক বয়স, রৈখিক বনাম পার্শ্বিক, লিঙ্গ, রক্ত-সম্পর্কীয় বনাম বিবাহসূত্রীয়, যোগসূত্রকারী জ্ঞাতির লিঙ্গীয় পরিচয় এবং কোন্ পক্ষের আত্মীয়।

১. **প্রজন্ম :** প্রজন্ম অনুসারে জ্ঞাতিদের পৃথক করা হয়ে থাকে বহু সমাজে। যেমন: বাবা এবং চাচা – এরা একই প্রজন্মের; দাদা, দাদার ভাই – এরা বাবা-চাচাদের এক প্রজন্ম উর্ধ্বে। এবং "নিজ" (ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Ego, ধরুন "আপনি") হচ্ছে, তার ভ্রাতৃকুলসহ, একটি ভিন্ন প্রজন্মের সদস্য। "নিজ" হতে আরো কনিষ্ঠ প্রজন্ম হবে ভাগনা-ভাগনি ইত্যাদি।

২. **আপেক্ষিক বয়স :** ইংরেজিভাষী মানুষজনের মধ্যে আপেক্ষিক বয়সের ধারণা নেই। যেমন আছে ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর আরো বিভিন্ন অঞ্চলে। আপেক্ষিক বয়সের একটি ভালো উদাহরণ হচ্ছে আমাদের সমাজে স্বামীর ভাইদের মধ্যেকার পৃথকীকরণ: স্বামীর ভাইদের মধ্যে বয়সানুসারে তফাৎ টানা হয়; বড় ভাইয়েরা হচ্ছেন স্ত্রী'র "ভাসুর" আর ছোট ভাইয়েরা হচ্ছেন তার "দেবর"। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের সাথে যুক্ত হচ্ছে আচরণ। দেবরদের সাথে ঠাট্টার সম্পর্ক অনুমোদিত, পক্ষান্তরে ভাসুরের সাথে সম্পর্ক হতে হবে দূরত্বের, শ্রদ্ধার।

৩. **রৈখিক বনাম পার্শ্বিক :** রৈখিক জ্ঞাতি (lineal kin) বলতে বোঝায় তাদের যারা একটি রেখাসূত্রে বাধা। যেমন: দাদা-বাবা-ছেলে। আর পার্শ্বিক জ্ঞাতি (collateral kin, সংক্ষেপে lateral-ও বলা হয়) হচ্ছেন তারা যাদের সাথে আপনি একজন যোগসূত্রকারী জ্ঞাতি'র মাধ্যমে সম্পর্কিত। যেমন ধরুন (বাঙ্গালি মুসলমান জ্ঞাতি পদাবলী অনুসারে) আপনার দাদার ভাইয়ের সাথে আপনি সংযুক্ত আপনার দাদার মাধ্যমে। অথবা আপনার নানীর বোনের সাথে আপনি সম্পর্কিত আপনার নানীর মাধ্যমে।

   বহু সমাজে, পার্শ্বিকতার ধারণা উপস্থিত, আবার বহু সমাজে এ ধারণা অনুপস্থিত। যেমন কিছু সমাজ আছে যেখানে বাবা আর চাচার মধ্যে কোন ভিন্নতা টানা হয়না। আবার একই সূত্রে মা এবং খালাদের মধ্যেও কোন পার্থক্য করা হয়না। মা এবং খালা সকলকেই "মা" হিসেবে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

৪. **লিঙ্গ :** ইংরেজিভাষী সমাজে, "aunt" এবং "uncle" পদ দুটোতে যে পার্থক্য টানা হয়ে থাকে, সেটাকে লিঙ্গীয় পার্থক্য বলা হয়। একই ভাবে "brother" (ভাই) এবং "sister" (বোন) পদ

দুইটির মধ্যে লিঙ্গীয় পার্থক্য দৃশ্যমান। কিন্তু "cousin" পদটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ। ছেলে হোক কি মেয়ে, দুজনেই "cousin"।

৫. **রক্ত-সম্পর্কিত বনাম বিবাহসূত্রীয়** : এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রক্তসূত্রে (consanguineal) সম্পর্কিত আত্মীয় বিবাহসূত্রে (affinal) সম্পর্কিত আত্মীয় হতে ভিন্ন। যেমন, রক্ত সম্পর্ক সূত্রে যিনি "মামা", বিবাহসম্পর্ক সূত্রে তিনি "মামা-শ্বশুর"। অথবা, "চাচী-শাশুড়ি"-কে যদিও বাঙ্গালি সমাজে সম্বোধন করা হয় "চাচী" হিসেবে, তার সাথে আত্মীয়তার ধরন যে বিবাহসূত্রীয়, এ বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য "শাশুড়ি" শব্দটি যুক্ত করা হয়ে থাকে।
ইংরেজিভাষী সমাজে, "uncle" পদ কিন্তু বিবাহ বা রক্তের এই তারতম্য ধারণ করেনা। "Uncle" বাবার দিকের রক্ত সম্পর্কীয় চাচাকেও বোঝাতে পারে, আবার বোঝাতে পারে খালুকেও যিনি কিনা রক্ত সম্পর্কের না, বরং মায়ের দিকের বিবাহ সূত্রের আত্মীয়।

৬. **যোগসূত্রকারী জ্ঞাতির লিঙ্গীয় পরিচয়** : যে সকল সমাজে পার্শ্বিক জ্ঞাতি গুরুত্বপূর্ণ, সে সকল সমাজে যোগসূত্রকারী জ্ঞাতির লিঙ্গীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যেমন কিনা কিছু সমাজে সমান্তরাল (parallel) কাজিনদের পৃথক করা হয়ে থাকে আড়াআড়ি (cross) কাজিনদের থেকে। সমান্তরাল কাজিন হচ্ছে বাবার ভাইয়ের এবং মার বোনের সন্তান। আড়াআড়ি কাজিন হচ্ছে বাবার বোনের এবং মার ভাইয়ের সন্তান। এই সব মূলনীতি সে সব সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সমান্তরাল কাজিনের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু আড়াআড়ি কাজিনের সাথে বিবাহ শুধু অনুমোদিত না, এ ধরনের বিবাহকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৭. **কোন পক্ষের বা দিকের আত্মীয়** : জ্ঞাতি পদাবলীর মধ্যে যখন বিভাজন বা পৃথকীকরণ ঘটে বাবা এবং মায়ের দিকের আত্মীয়দের মধ্যে, সেটাকে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন দ্বিখন্ডিতকরণ; জ্ঞাতি ব্যবস্থা হিসেবে সেটা পরিচিত দ্বিখন্ডিত জ্ঞাতি ব্যবস্থা (bifurcated kinship system) হিসেবে। যেমন ধরুন, মায়ের ভাই এবং বাবার ভাইয়ের জন্য ভিন্ন পদাবলীর ব্যবহার।

জ্ঞাতি পদাবলীর ব্যবস্থার ধরন (Types of Kin Term Systems)

মর্গানের দৃষ্টিতে, জ্ঞাতি পদাবলী দুই ধরনের : শ্রেণীবাচক এবং বর্ণনাসূচক। শ্রেণীবাচক জ্ঞাতি পদাবলী একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করে রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতিদের (যেমন ধরুন, হাওয়াই জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায়, বাবা এবং চাচাদের ক্ষেত্রে একই জ্ঞাতি পদ ব্যবহার করা হয়)। অপর পক্ষে বর্ণনাসূচক জ্ঞাতি পদাবলী রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতিদের পৃথক করে (যেমন ধরুন, এস্কিমো জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা যেখানে "বাবা" বলতে জৈবিক বাবাকেই বোঝানো হয়ে থাকে)। মর্গানের মতে শ্রেণীবাচক জ্ঞাতি পদ হচ্ছে "আদিম" এবং বর্ণনাসূচক জ্ঞাতি পদ হচ্ছে "উন্নততর"।

মর্গানের দৃষ্টিতে, জ্ঞাতি পদাবলী দুই ধরনের: শ্রেণীবাচক (classificatory) এবং বর্ণনাসূচক (descriptive)।

জ্ঞাতি পদাবলীর বিভিন্ন ব্যবস্থার আলোচনায় যাবার পূর্বে নৃবিজ্ঞানে জ্ঞাতিসম্পর্ক কিভাবে নকশা-আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে, তার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। দেখুন চিত্র ১। নৃবিজ্ঞানের জ্ঞাতি নকশায় খেয়াল করে দেখবেন সব সময় একজন 'ego', যার বাংলা আমরা করছি "নিজ", তাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই "নিজ" হচ্ছে ধরুন আপনি। আপনার অবস্থান হতে জ্ঞাতি দলের সদস্য কারা (এবং কারা সদস্য নন), তা নকশার মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়। এতে বুঝতে সুবিধা হয়। নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যবইতে এই "নিজ"টি সব সময় পুরুষ হয়; এর মাধ্যমে জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের পুরুষ-পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে। চিত্র ১ ভালো করে দেখুন, কোন সংকেত কিসের চিহ্ন তা পাশে লেখা আছে। চিত্রে তিন প্রজন্মের একটি কাল্পনিক জ্ঞাতি দলকে দেখান হয়েছে। নিজ বা ego'র দৃষ্টিতে প্রথম প্রজন্মে আছে দাদা-দাদী এবং উভয়ের ভাই ও বোন। আরো আছেন, নানা-নানী এবং উভয়ের

ভাই-বোন। দ্বিতীয় প্রজন্মে আছে বাবা-মা এবং তাদের ভাই ও বোন। তৃতীয় প্রজন্মে, চিত্রে দেখানো হয়েছে আপনাকে, আপনার ভাই ও বোন, এবং আপনার চাচাত, ফুপাত, খালাত ও মামাত ভাই ও বোনকে।

চিত্র ১: জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্ক

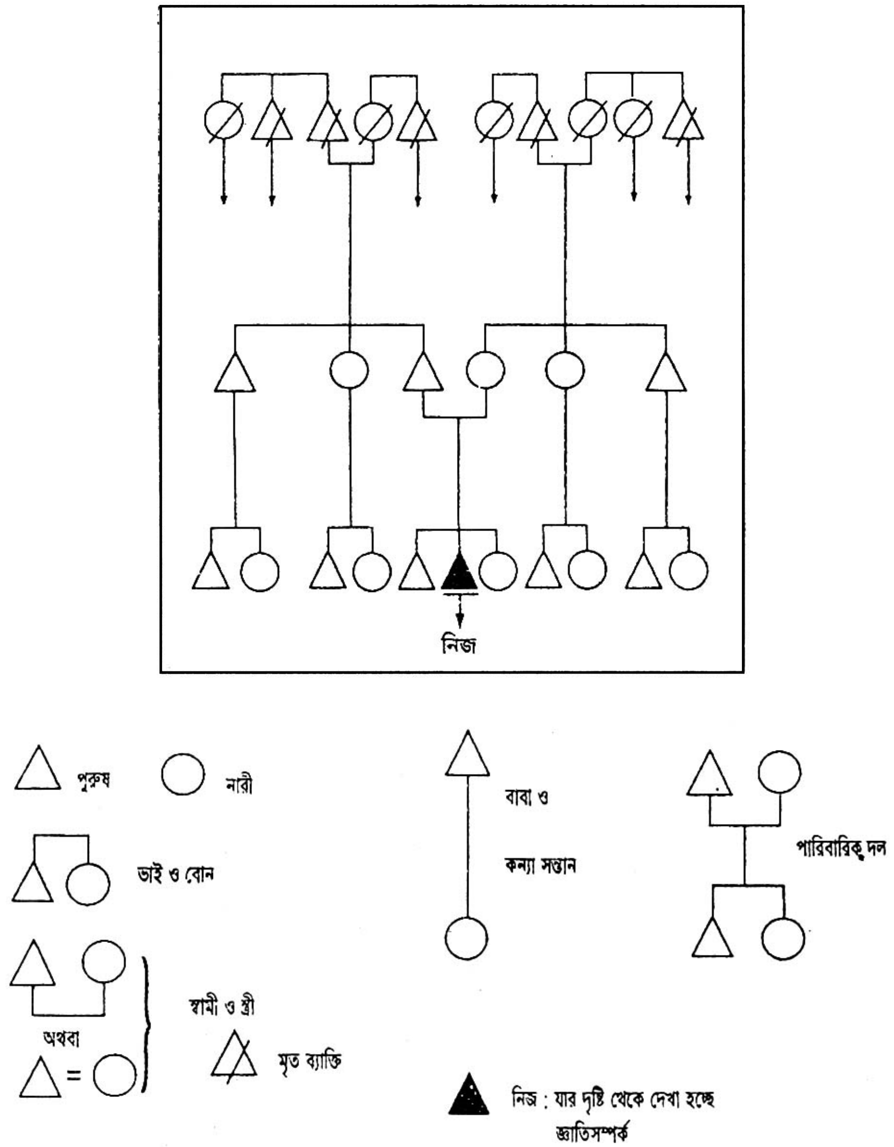

সূত্র: Roger M. Keesing (1975) *Kin Groups and Social Structure*, Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher, পৃ: ১৫।

মার্ডক ছয় ধরনের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা চিহ্নিত করেন, যথা: ১.হাওয়াই, ২. এস্কিমো, ৩. ইরোকওয়া, ৪. ওমাহা, ৫. ক্রো. এবং ৬.সুদানি।

মার্ডক ছয় ধরনের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা চিহ্নিত করেন, যথা: ১.হাওয়াই, ২.এস্কিমো, ৩. ইরোকওয়া, ৪. ওমাহা, ৫. ক্রো, এবং ৬.সুদানি। নিচে এই ছয়টি ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হ'ল।

১. **হাওয়াই:** এই নামের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা পলিনেশিয়া অঞ্চলে প্রচলিত। তুলনামূলকভাবে এই পদাবলী ব্যবস্থা সহজ, কারণ এতে আছে কম জ্ঞাতি পদাবলী। হাওয়াইয়ের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হ'ল দুটি: প্রজন্মের ফারাক এবং মা এবং বাবার দিককার আত্মীয়দের উপর সমান গুরুত্ব আরোপন। বাবা-মায়ের প্রজন্মে, বাবা, বাবার ভাই এবং মায়ের ভাই, একই পদভুক্ত। ঠিক একইভাবে, মা, মায়ের বোন এবং বাবার বোন একই পদভুক্ত। ভাইদের ক্ষেত্রেও তাই (ভাই হচ্ছেন আপন, চাচাত, ফুপাত, মামাত এবং খালাত ভাই)। লক্ষ্য করবেন যে জ্ঞাতি পদ ও জ্ঞাতি সম্বোধন, এ দুটো ভিন্ন বিষয়। পদ বলতে বোঝায় শ্রেণীকরণ, যেমন ধরুন বাংলা ভাষায় ভাই বা ভ্রাতা একই শ্রেণীর জ্ঞাতিকে বোঝায়, বোন বা ভগ্নী আরেক শ্রেণীর জ্ঞাতিকে বোঝায়। কিন্তু এই শ্রেণীর জ্ঞাতিকে সম্বোধন করার বিশেষ রীতি রয়েছে এই অঞ্চলের বাঙ্গালি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে। ভাইদের মধ্যে যিনি বড় তাকে সম্বোধন করা হয়, বড়/মেজ/সেজ "দাদা" বা "ভাই" হিসেবে; "নিজ" এর থেকে বয়সে যারা ছোট তাদের নাম ধরে ডাকা হয়। ২ নম্বর চিত্র, "হাওয়াই সমাজের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা" দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত ২, ৩ এবং ৬-এর জন্য; মায়ের পদ সংরক্ষিত ১, ৪ এবং ৫-এর জন্য। নিজ প্রজন্মের সকলের (আপন ভাইবোন এবং কাজিনরা) হচ্ছেন ভাই ও বোন।

"হাওয়াই সমাজের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা" দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত ২, ৩ এবং ৬-এর জন্য; মায়ের পদ সংরক্ষিত ১, ৪ এবং ৫-এর জন্য। নিজ প্রজন্মের সকলের (আপন ভাইবোন এবং কাজিনরা) হচ্ছেন ভাই ও বোন। হাওয়াইয়ের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। দ্বিতীয়ত, মা এবং বাবার দিকের আত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না।

হাওয়াইয়ের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। দ্বিতীয়ত, মা এবং বাবার দিকের আত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না।

চিত্র ২: হাওয়াই সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

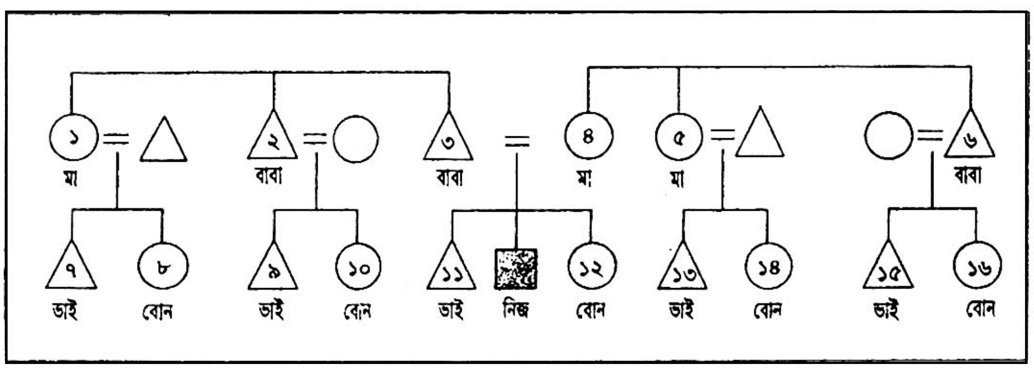

সূত্র: William A. Haviland (1999) *Cultural Anthropology*, 9th edition, Florida: Harcourt Brace College Publishers, পৃ: ৩০৮।

২. **এস্কিমো:** এস্কিমো পদাবলী ব্যবস্থা পাওয়া যায় পশুশিকার এবং খাদ্য সংগ্রহকারী সমাজে। আবার, একই ধরনের পদাবলীর ব্যবহার পাশ্চাত্যের সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থায় গুরুত্ব আরোপন করা হয় একক পরিবার-এর উপর। মাতা, পিতা, বোন, ভাই, কন্যা, পুত্র – এদের জন্য যে জ্ঞাতি পদ ব্যবহার করা হয় সেগুলো আর কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত, একক

পরিবারের বাইরে বহু সদস্যদের একটি মাত্র পদ দিয়ে একত্রীভূত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, "uncle", "aunt", কিংবা "cousin"। ৩ নম্বর চিত্র "এস্কিমো সমাজে জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা" দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত নিজের বাবার জন্য; মায়ের পদটিও একইভাবে কেবলমাত্র নিজ মায়ের জন্য সংরক্ষিত। আপন ভাইবোনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, বাকি সকলে – মামাত, ফুপাত, চাচাত ও খালাত ভাইবোনেরা হচ্ছেন কাজিন।

এস্কিমো জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা বর্জনকারী (exclusive)এবং অন্দর্ভুক্তিকারী (inclusive)

এস্কিমো জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, ক্ষেত্র বিশেষে এই পদাবলী ব্যবস্থা বর্জনকারী (exclusive): রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতির ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ সুনির্দিষ্ট যেমন মা এবং বাবা, ভাই এবং বোন – এদের ক্ষেত্রে যে পদ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই পদগুলো আর কোন জ্ঞাতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে না। আবার, অন্যভাবে দেখলে এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিকারী (inclusive)। বাবা এবং মায়ের দিককার আত্মীয়ের মধ্যে কোন পৃথকীকরণ করা হচ্ছে না। বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত আত্মীয় এবং রক্তসূত্রে সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য টানা হচ্ছে না। অনেক নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, ইঙ্গ-মার্কিন জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে এস্কিমো পদাবলী ব্যবস্থা।

চিত্র ৩: এস্কিমো সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

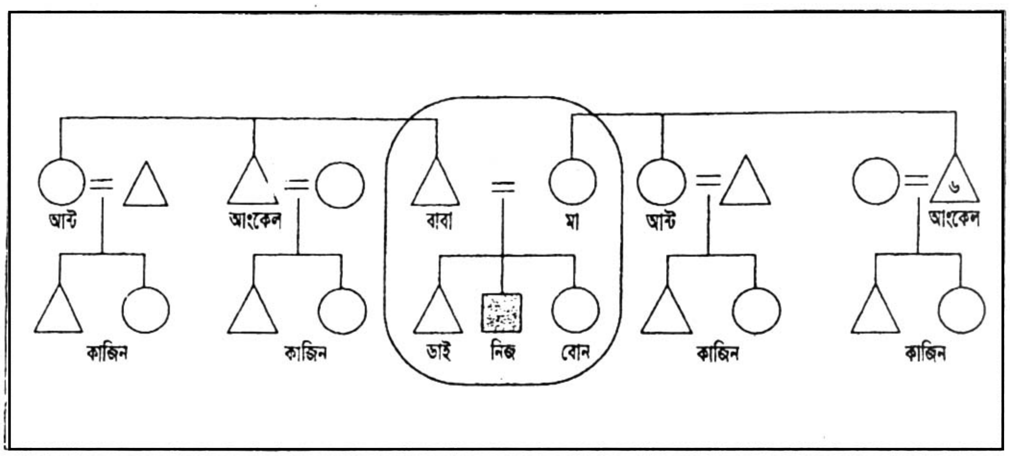

সূত্র: William A. Haviland (1999) *Cultural Anthropology*, 9th edition, Florida: Harcourt Brace College Publishers, পৃ: ৩০৭

৩. **ইরোকওয়া :** ইরোকওয়া (ইংরেজী বানান, "Iroquois") ব্যবস্থায় বাবা এবং বাবার ভাই একই পদ দ্বারা অভিহিত, মা এবং মায়ের বোনের ক্ষেত্রে রয়েছে একই পদ; কিন্তু বাবার বোন এবং মায়ের ভাই – এদের পদ ভিন্ন। "নিজ"-এর প্রজন্মের ক্ষেত্রে ভাই, বোন এবং সমান্তরাল কাজিন (অর্থাৎ, বাবার ভাই এবং মায়ের বোনের সন্তান) সকলের পদ একই। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, এটি যৌক্তিক

যেহেতু নিজ এই কাজিনদের বাবা ও মাকে নিজের বাবা, নিজের মায়ের পদভুক্ত করেন। আড়াআড়ি কাজিনদের (বাবার বোন ও মায়ের ভাইয়ের সন্তান) পদ নিজ ভাইবোন ও সমান্তরাল কাজিনদের থেকে ভিন্ন। এই ব্যবস্থায় বিবাহ-সঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি কাজিনদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ৪ নম্বর চিত্র, "ইরোকওয়া সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা" দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত ২ এবং ৩-এর জন্য; মায়ের পদ সংরক্ষিত ৪ এবং ৫-এর জন্য। নিজ প্রজন্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ হচ্ছেন ভাই ও বোন; ৭, ৮, ১৫ এবং ১৬ হচ্ছেন কাজিন।

ইরোকওয়া জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: একক পরিবারের সদস্যদের সাথে পার্শ্বিক জ্ঞাতির একত্রীকরণ (মা এবং মায়ের বোন, বাবা এবং বাবার ভাই) এবং, সমান্তরাল ও আড়াআড়ি কাজিনদের মধ্যেকার বিভাজন।

যদিও ইরোকওয়া জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে উত্তর আমেরিকার ইরোকওয়া আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে, এই ব্যবস্থার প্রচলন বহু অঞ্চলে দেখা যায়। নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, এই ব্যবস্থা একসূত্রীয় বংশধারার সাথে সম্পৃক্ত। চীনের গ্রামীণ সমাজে কিছুকাল আগেও এর প্রচলন দেখা গেছে।

ইরোকওয়া জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: একক পরিবারের সদস্যদের সাথে পার্শ্বিক জ্ঞাতির একত্রীকরণ (মা এবং মায়ের বোন, বাবা এবং বাবার ভাই) এবং, সমান্তরাল ও আড়াআড়ি কাজিনদের মধ্যেকার বিভাজন।

চিত্র ৪: ইরোকওয়া সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

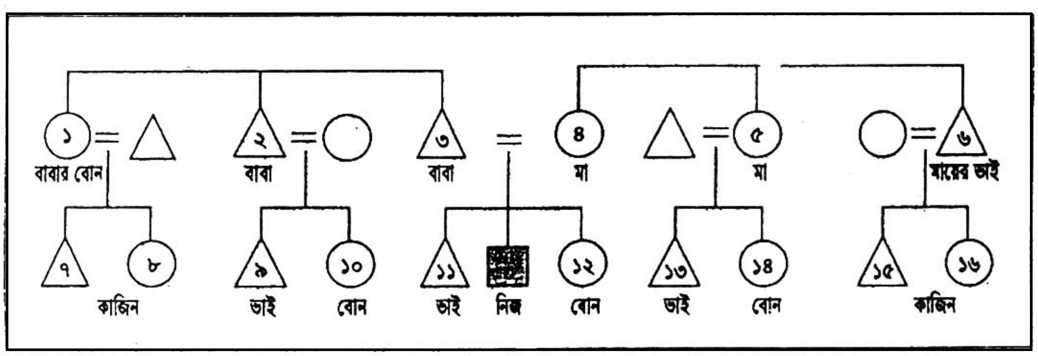

সূত্র: William A. Haviland (1999) *Cultural Anthropology*, 9th edition, Florida: Harcourt Brace College Publishers, পৃ: ৩০৯

ওমাহা সমাজ জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা মূল বিষয় হচ্ছে মায়ের দিকে ভিন্ন প্রজন্মের সদস্যদের একত্রীকরণ। আবার বাবার দিকে একই প্রজন্মের সদস্যদের এক প্রজন্ম নিচে নামিয়ে দেয়া হয়।

৪. **ওমাহা :** ওমাহা ব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান। নেব্রাস্কা অঞ্চলের আদিবাসী আমেরিকান একটি জাতির নাম ওমাহা, তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হওয়া সূত্রেই এর নাম

ওমাহা। মজার ব্যাপর হ'ল, ওমাহা জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায় কেবলমাত্র মা এবং মায়ের বোন নয়, মায়ের ভাইয়ের মেয়েও একই জ্ঞাতিপদের অন্তর্ভুক্ত। এই তিন শ্রেণীর জ্ঞাতি হচ্ছেন "মা"। কেবলমাত্র মামা নন, তার পুত্র সন্তানও একই জ্ঞাতিপদভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর জ্ঞতি হচ্ছেন "মামা"। "বাবা" পদভুক্ত হচ্ছেন বাবা এবং বাবার ভাই। আর বাবার বোন অর্থাৎ ফুফুর ছেলে এবং মেয়েরা হচ্ছেন "ভাগনা" এবং "ভাগনি"। আপন বাবা-মা, চাচা ও খালার সন্তানেরা হচ্ছেন ভাই ও বোন। ৫ নম্বর চিত্র "ওমাহা সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা" দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত ২ এবং ৩-এর জন্য; মায়ের পদটি সংরক্ষিত ৪, ৫ এবং ১৬-এর জন্য। একইভাবে ৬ এবং ১৫ ভিন্ন প্রজন্মের হওয়া সত্ত্বেও একই পদভুক্ত। নিজ প্রজন্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ হচ্ছেন ভাই ও বোন পদভুক্ত; ৭ এবং ৮ যদিও নিজের প্রজন্মের, তাঁরা হচ্ছেন ভাগনা-ভাগনি শ্রেণীভুক্ত।

এই ব্যবস্থায় মূল বিষয় হচ্ছে মায়ের দিকে ভিন্ন প্রজন্মের সদস্যদের একত্রীকরণ (মা-খালার সাথে মায়ের ভাইয়ের মেয়ে, মায়ের ভাইয়ের সাথে মায়ের ভাইয়ের পুত্র)। আবার, বাবার দিকে একই প্রজন্মের সদস্যদের এক প্রজন্ম নিচে নামিয়ে দেয়া (ফুফুর ছেলেমেয়ে ভাইবোন বা কাজিন না হয়ে হচ্ছেন ভাগনা-ভাগনি)।

চিত্র ৫: ওমাহা সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

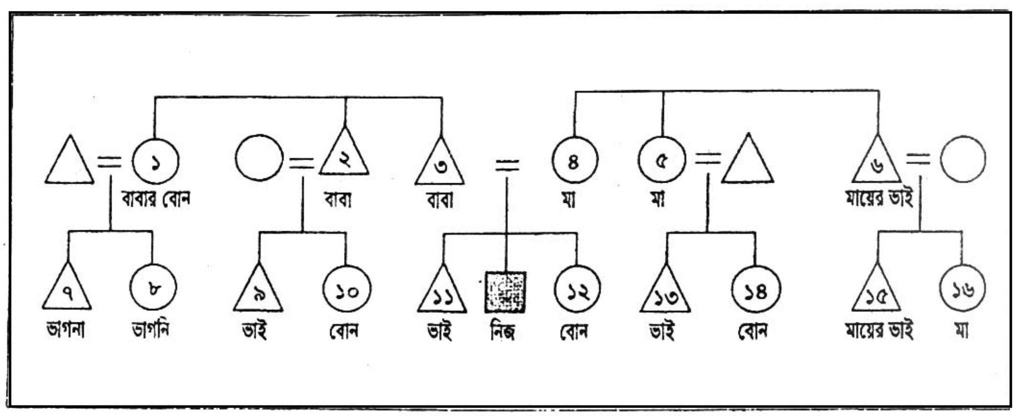

সূত্রঃ William A. Haviland (1999) *Cultural Anthropology*, 9th edition, Florida: Harcourt Brace College Publishers, পৃঃ ৩১১

৫. **ক্রো:** ক্রো হচ্ছে আরেক আমেরিকান আদিবাসী জাতির নাম যারা মন্টানা অঞ্চলের বাসিন্দা। একই পদাবলীর ব্যবস্থা দেখা গেছে হোপিদের মধ্যে। হোপিরা হচ্ছেন আমেরিকার আরেক আদিবাসী জাতি। এ বাদে, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও একই জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা দেখা গেছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, এদের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা হচ্ছে ওমাহা ব্যবস্থার মাতৃসূত্রীয় সংস্করন। ক্রো ব্যবস্থায় বাবা

এবং বাবার ভাই একই পদভুক্ত। মা এবং মায়ের বোন একই পদভুক্ত। এদের – অর্থাৎ আপন মা-বাবা, মায়ের বোন এবং বাবার ভাই – সকলের সন্তান হচ্ছে নিজের ভাইবোন। বাবার বোন এবং বাবার বোনের কন্যা একই পদভুক্ত (বাংলা ভাষায় বললে দুজনেই হচ্ছেন ফুফু); বাবার বোনের পুত্র হচ্ছেন বাবা। মায়ের ভাইয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মায়ের ভাইয়ের পুত্র-কন্যা হচ্ছে নিজের পুত্র ও কন্যা: তারা এবং "নিজ" একই প্রজন্মের হলেও জ্ঞাতি পদাবলীর দিক থেকে তারা এক প্রজন্ম নিচে। ৬ নম্বর চিত্র "ক্রো সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা" দেখুন। ৭, ২ এবং ৩ ভিন্ন দুই প্রজন্মের হলেও বাবা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত; ১ এবং ৮ – এরাও দুই প্রজন্মের – কিন্তু দুজনেই বাবার বোন হিসেবে একই শ্রেণীভুক্ত; ৪ এবং ৫ হচ্ছেন মা শ্রেণীর। ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ হচ্ছেন ভাইবোন শ্রেণীর; ১৫ এবং ১৬ হচ্ছেন পুত্র-কন্যা শ্রেণীর।

ক্রো জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সমান্তরাল কাজিনরা (চাচাত ও খালাত) একই শ্রেণীভুক্ত। আড়াআড়ি কাজিনদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাঁরা বাবার দিকের তাঁরা নিজের এক প্রজন্ম উর্ধ্বে শ্রেণীভুক্ত; আর যাঁরা মায়ের দিকের তাঁরা এক প্রজন্ম নিচে শ্রেণীভুক্ত।

ক্রো জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সমান্তরাল কাজিনরা (চাচাত ও খালাত) একই শ্রেণীভুক্ত। আড়াআড়ি কাজিনদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাঁরা বাবার দিকের তাঁরা নিজের এক প্রজন্ম উর্ধ্বে শ্রেণীভুক্ত; আর যাঁরা মায়ের দিকের তাঁরা এক প্রজন্ম নিচে শ্রেণীভুক্ত।

চিত্র ৬: ক্রো সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

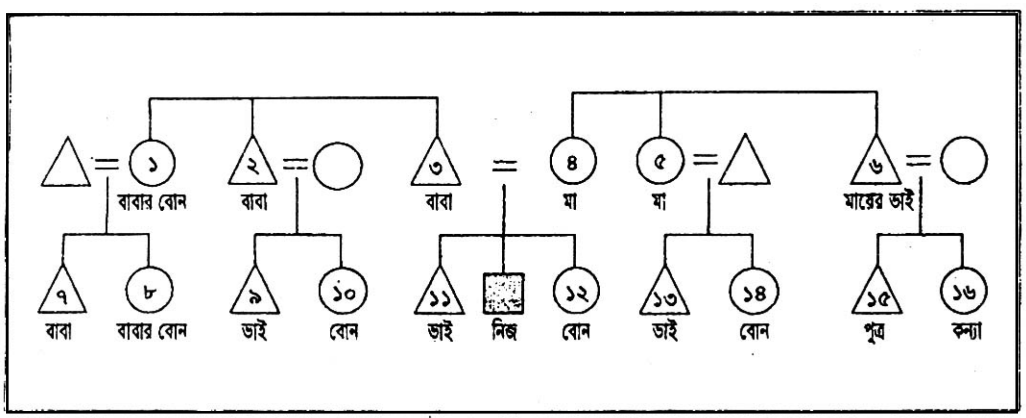

সূত্র: William A. Haviland (1999) *Cultural Anthropology*, 9th edition, Florida: Harcourt Brace College Publishers, পৃ: ৩১০

৬. **সুদানী:** সুদানী নামে পরিচিত এই জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা আফ্রিকার দক্ষিণ সুদান অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। এ কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে সুদানী জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা। চীনের গ্রামীণ সমাজে ইরোকওয়া জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার পরিবর্তে কিছুকাল ধরে সুদানী জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে এই ব্যবস্থার প্রচলন অন্য ব্যবস্থার তুলনায় কম। এই ব্যবস্থায় বাবা এবং মা, তাদের ভাই এবং বোন – এদের সকলের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক পদ। আপন ভাই এবং বোনের জন্য পৃথক পৃথক পদ রয়েছে। একই সাথে, বাবা ও মায়ের ভাইবোনদের

সুদানী জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা অন্য সকল ব্যবস্থা হতে খুব ভিন্ন। কারণ এই ব্যবস্থায় জ্ঞাতিদের খুব সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করা হয়।

সন্তানেরা ভিন্ন ভিন্ন পদে শ্রেণীভুক্ত। এই ব্যবস্থা অন্য সকল ব্যবস্থা হতে খুব ভিন্ন। কারণ এই ব্যবস্থায় জ্ঞাতিদের খুব সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করা হয়: বাবা, মা, চাচা, খালা, বড় ফুফু, মেজ মামা, চাচাত বোন ইত্যাদি। এই জ্ঞাতি ব্যবস্থাকে নৃবিজ্ঞানীরা "বর্ণনাসূচক" ব্যবস্থা বলেন। বাঙ্গালি মুসলমান জ্ঞাতি পদাবলীর সাথে সুদানী জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থার সমূহ মিল রয়েছে । ৭ নম্বর চিত্র " সুদানী সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা" দেখুন।

চিত্র ৭: সুদানী সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

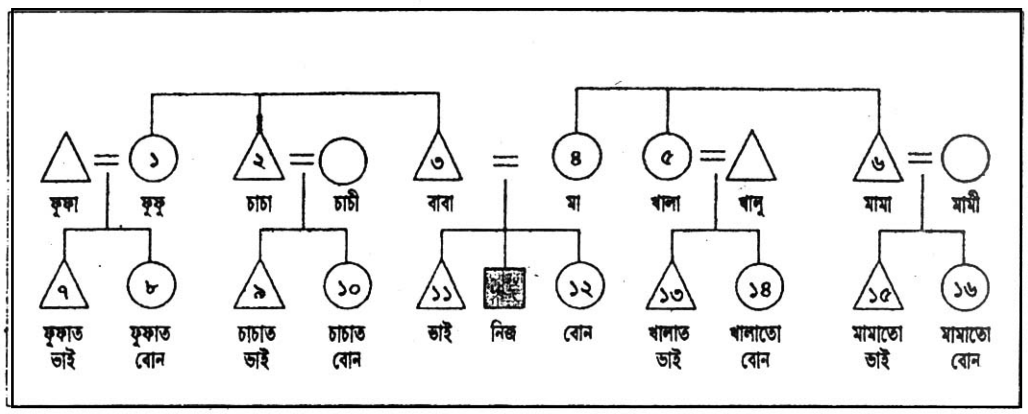

<u>সূত্র</u>: লেখকের তৈরী।

সারাংশ

এই পাঠে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের 'প্রজাপতি সংগ্রহ' পর্ব তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই পর্বকে পিছনে-ফেলে-আসা-পর্ব হিসেবে দেখলে, ভুল করা হবে। বহু বিশ্ববিদ্যালয় মহলে, বহু প্রকাশনায় এই ধারা অবিকৃত রূপে এখন পর্যন্ত চর্চিত হচ্ছে। এই ধারা সমালোচিত হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ ছিল এটি জ্ঞাতিত্বকে দাঁড় করায় স্বতন্ত্র, এবং সমাজের অপরাপর প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষেত্র হিসেবে। আগামী পাঠগুলোতে দেখবেন যে, নতুন এবং পুনর্গঠিত জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: জ্ঞাতিত্বের অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্তর্প্রবিষ্টতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা, সেটার অনুসন্ধান করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। মর্গানের দৃষ্টিতে, জ্ঞাতি পদাবলী কত ধরনের ?

ক. ২ ধরনের   খ. ৩ ধরনের
গ. ৪ ধরনের   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২। কোন জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায় রৈখিক ও পার্শ্বিক জ্ঞাতির মধে কোন পার্থক্য করা হয় না?

ক. হাওয়াই   খ. ইরোকওয়া
গ. এস্কিমো   ঘ. ক্রো

৩। কোন জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা বর্জনকারী (exclusive) ও অন্তর্ভুক্তিকারী (inclusive)?

ক. হাওয়াই   খ. ক্রো
গ. এস্কিমো   ঘ. ওমাহা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার মূলনীতি কী?
২। জ্ঞাতি পদাবলীর ধরনকে মর্গান ক'ভাগে বিভাজিত করেছেন এবং সেগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞাতিত্ব শ্রেণীকরণের কার্যকলাপকে লীচ কেন "প্রজাপতি" সংগ্রহের সাথে তুলনা করেছেন? আপনি কি লীচের সমালোচনার সাথে একমত? উত্তরের পক্ষে যুক্তি লিখুন।
২। জ্ঞাতি শ্রেণীকরণের মূলনীতি অথবা জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার ধরন বর্ণনা করুন।

পাঠ - ৪

বংশধারা তত্ত্ব
Descent Theory

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- বংশধারা কি এবং এই তত্ত্ব কোন সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ ছিল
- বংশীয় দলের সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস
- বংশ ধারা নিরূপনের মূলনীতি

এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ভাবনা এক দিকে ছিল ভূখন্ড এবং জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক নির্ণয়, অপর দিকে, পরিবার এবং অধিকতর বৃহত্তর সামাজিক একক যেমন ক্ল্যান, জেন এবং সিব – এদের আন্তঃসম্পর্ক উদ্‌ঘাটন।

নৃবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন হতে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন ছিল নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়। আপনারা ৩ নং পাঠে দেখেছেন কিভাবে মর্গান-অনুসরণে প্রাথমিক পর্যায়ের নৃবিজ্ঞান গুরুত্ব দিয়েছিল জ্ঞাতিত্ব পদাবলীর উপর। মর্গানের প্রভাবের কারণে গত শতকের প্রথম দশকগুলোতে জ্ঞাতি অধ্যয়ন বলতে বোঝাত বিভিন্ন সমাজের জ্ঞাতি পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা। ম্যালিনোস্কি এবং কাঠামোগত ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীরা, এধরনের "জ্ঞাতি এলজেব্রা" থেকে সরে দাঁড়ালেন। একে জ্ঞাতি এলজেব্রা বলা হয়েছিল কারণ যুক্তিবিদ্যা বা logic-এর মতনই এগোচ্ছিল জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন – আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতি, নানারকমের অর্থহীন শ্রেণীকরণ তৈরি ইত্যাদি। ম্যালিনোস্কি এবং কাঠামোগত ক্রিয়াবাদীরা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নকে ঢেলে সাজালেন। তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করলেন জ্ঞাতিত্বের সামাজিক প্রেক্ষিতের উপর। কোন্ সমাজে কোন্ জ্ঞাতি সম্পর্ক কোন্ ধরনের ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে – এই ছিল তাঁদের মনোযোগের জায়গা। জ্ঞাতিত্ব নিয়ে গবেষণা এবং তাত্ত্বিক লেখালেখির মাধ্যমে কাঠামোগত ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী হয়ে উঠল। এদের প্রধান অবদান বংশধারা বা গোষ্ঠী তত্ত্ব।

যখন মাঠকর্ম-ভিত্তিক গবেষণা এবং ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠে, তখন এই ভাবনা শক্ত-পোক্তভাবে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে দানা বাঁধে যে সামাজিক সংগঠনের প্রধান একক হচ্ছে গোষ্ঠী।

বংশধারা তত্ত্ব ১৯৪০ হতে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করে। একই সময়কালে এই তত্ত্ব মার্কিনী সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে প্রভাবশালী ছিল। এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ভাবনা এক দিকে ছিল ভূখন্ড এবং জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক নির্ণয়, অপর দিকে, পরিবার এবং অধিকতর বৃহত্তর সামাজিক একক যেমন ক্ল্যান, জেন এবং সিব – এদের আন্তঃসম্পর্ক উদ্‌ঘাটন। বংশধারা তত্ত্ব বিবর্তনবাদ হতে জন্মলাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে, যখন মাঠকর্ম-ভিত্তিক গবেষণা এবং ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠে, তখন এই ভাবনা শক্ত-পোক্তভাবে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে দানা বাঁধে যে সামাজিক সংগঠনের প্রধান একক হচ্ছে গোষ্ঠী। এবং আস্তে-আস্তে বিবর্তনবাদী ধারণা – যেমন গোষ্ঠী মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তনের কোন পর্যায়ে উদ্ভাবিত হ'ল – গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এর পরিবর্তে, সামাজিক সংগঠন হিসেবে গোষ্ঠী কিভাবে সামাজিক ভারসাম্য নিশ্চিত করে – এই ধরনের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন এবং আরো পরে মেয়ার ফোর্টস, ইভানস্-প্রিচার্ড প্রধানত আফ্রিকায় কাজ করেন এবং সেখানকার সমাজে করা গবেষণার সাহায্যে গোষ্ঠী তত্ত্ব তৈরী করেন। এই তত্ত্ব এতই শক্তিশালী ছিল যে এক সময় নৃবিজ্ঞানীদের মনে হয়েছিলো পৃথিবীর সকল সমাজেই গোষ্ঠী কিংবা বংশ আছে, থাকতে বাধ্য। ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভী-স্ট্রস'এর মৈত্রীবন্ধনতত্ত্ব পরে বংশধারা তত্ত্বকে ম্লান করে দেয়।

বংশধারা

বংশধারা (descent) বলতে বোঝান হয়ে থাকে বংশের ধারা। বংশের ধারা নিরূপনের বেলায়, নৃবিজ্ঞানীদের কাছে প্রধান জিজ্ঞাসা হচ্ছে: এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্ম অর্থাৎ, পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তান, এ দুই প্রজন্মের সম্পর্ক কিভাবে সংগঠিত? বংশধারা তাত্ত্বিকদের মতে, প্রতিটি ব্যক্তির সাথে তার *পূর্বপুরুষদের* সম্পর্ক দুইভাবে সংগঠিত হতে পারে। হয় তার বাবার মাধ্যমে, অথবা তার

মায়ের মাধ্যমে। তার *উত্তরসূরীদের* বেলায়, অর্থাৎ, তার পরবর্তী প্রজন্মের সাথে, তার সম্পর্ক নিরূপনের মাধ্যম হতে পারে, হয় তার কন্যাসন্তান অথবা তার পুত্রসন্তান। মনে রাখবেন যে, কোন নির্দিষ্ট বংশধারা ব্যবস্থায়, কিছু সূত্রিতার (lineal link) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, আর কিছু সূত্রিতা গুরুত্বহীন হিসেবে দেখা হয়।

বংশধারা বলতে বোঝান হয়ে থাকে বংশের ধারা। ... যদি, পিতা সূত্রিতার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তাহলে সেটা হয় পিতৃসূত্রীয় বংশধারা। ... যদি উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ মা যদি হন এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মের সূত্রিতার মাধ্যমে, তাহলে সেটাকে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন মাতৃসূত্রীয়, জড়ায়ুসূত্রীয় বংশধারা।

সাধারণত দেখা যায় যে, কোন একটি বিশেষ লিঙ্গীয় সূত্রিতার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। অপরটির উপর না। একে বলে **একরৈখিক বংশধারা নীতি** (unilineal descent rule), যেহেতু সেই সমাজে কেবলমাত্র একটি সূত্রিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। যদি, পিতা সূত্রিতার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তাহলে সেটা হয় *পিতৃসূত্রীয়* (patrilineal, agnatic) বংশধারা। এই নীতি অনুসারে পুরুষ হচ্ছেন পূর্বসুরী, এবং দলগত সদস্যপদ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে অটুট এবং একাদিক্রমে পুরুষ সূত্রিতার মাধ্যমে (পুরুষ পূর্বসূরীর ছেলে, তার ছেলের ছেলে, তার ছেলের ছেলের ছেলে ইত্যাদি)। যদি উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ, মা যদি হন এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মের সূত্রিতার মাধ্যম, তাহলে সেটাকে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন *মাতৃসূত্রীয়* কিংবা *জড়ায়ুসূত্রীয়* (matrilineal, uterine) বংশধারা। এই নীতি অনুসারে একমাত্র নারীই হতে পারেন পূর্বসূরী এবং দলগত সদস্যপদ নির্ধারণ করা হয় অটুট এবং একাদিক্রমে নারীর মাধ্যমে (নারী পূর্বসুরীর কন্যা, তার কন্যার কন্যা, তার কন্যার কন্যার কন্যা ইত্যাদি)।

কিছু সমাজে দেখা যায় যে, দুটি একরৈখিক বংশধারা নীতিই বিদ্যমান। .... সেগুলো নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায়, দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা নীতি....

কিন্তু পৃথিবীর সকল সমাজ কেবল পিতৃসূত্রীয় অথবা মাতৃসূত্রীয়ভাবে সংগঠিত হয় না। কিছু সমাজে দেখা যায় যে, দুটি একরৈখিক বংশধারা নীতিই বিদ্যমান। এ ধরনের নীতিমালা যে সকল সমাজে প্রযোজ্য, সেগুলো নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায়, **দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা নীতি** (double-unilineal descent) দ্বারা সংগঠিত। কিন্তু বিষয়গুলো আরও জটিল। একরৈখিক এবং দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা নীতি বাদে, কিছু-কিছু সমাজে, আরেক ধরনের সূত্রিতা বিদ্যমান। সেখানে প্রচলিত, নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায়, **অন-একরৈখিক বংশধারা নীতি** (non-unilineal descent)। অন-একরৈখিক হতে পারে দুই ধরনের: *অনুষঙ্গিক* (cognatic) এবং *দ্বিপাক্ষিক* বা *দ্বিপার্শ্বিক* (bilateral) বংশধারা। অনুষঙ্গিক নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত বংশীয় দল হচ্ছে সেটি যার সদস্য নির্ধারিত হতে পারে পূর্বপুরুষ অথবা পূর্বনারীর মাধ্যমে, একাদিক্রমে পুরুষ অথবা নারী সূত্রিতার মাধ্যমে, অথবা এ দুটো সূত্রিতার বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে। অন্য কথায়, পূর্বসূরী যেমন হতে পারেন নারী কিংবা পুরুষ, আবার একই সাথে, সেই পূর্বসূরীর সাথে সূত্রিতার সম্পর্ক একান্তভাবে নারী বা পুরুষের মাধ্যমে নয়। অর্থাৎ, অনুষঙ্গিক বংশধারার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন লিঙ্গীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিপাক্ষিক বা দ্বিপার্শ্বিক সূত্রিতা ইউরোপ, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। একজন ব্যক্তি (নারী বা পুরুষ) তার বংশ সূত্রিতা, সকল পূর্বসূরী নারী এবং পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যে দাঁড় করাচ্ছেন।

দ্বৈত সূত্রীয় বংশধারা (সংক্ষেপে দ্বিসূত্রীয়; bilineal descent) দ্বিপাক্ষিক/দ্বিপার্শ্বিক বংশধারা হতে ভিন্ন। অস্ট্রেলিয়ার কিছু আদিবাসী জাতির মধ্যে দেখা গেছে যে, পিতৃ-এবং মাতৃ-সূত্রিতা আড়াআড়ি ভাবে সম্পর্কিত। নৃবিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন দ্বৈত সূত্রীয় বংশধারা।

কোন্ কোন্ নীতির ভিত্তিতে বংশ সংগঠিত হয়ে থাকে, তা ছিল উপরের আলোচনার বিষয়। মনে রাখবেন, বংশ হচ্ছে একটি সামাজিক দল। সামাজিক দল হিসেবে এটি বিশেষ বিশেষ নীতি দ্বারা গঠিত। বিশেষ ধরনের বংশীয় নীতি বিশেষ ধরনের বংশীয় দল গঠন করে। যেমন: পুরুষ সূত্রিতা গঠন করে পিতৃসূত্রীয় বংশ ইত্যাদি।

গোষ্ঠী, গোত্র, ফ্রাত্রি এবং ময়টিঃ গোষ্ঠী (lineage) হচ্ছে একটি জ্ঞাতিদল যার সদস্যরা তাদের বংশীয় সূত্রিতা পুরুষ পরম্পরা কিংবা নারী পরম্পরার মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। গোষ্ঠী হচ্ছে পূর্বসূরী কেন্দ্রীক। সদস্য হিসেবে তখনই কাউকে গ্রহণ করা হয় যখন তিনি নির্দিষ্ট পূর্বসূরীর সাথে তাঁর সূত্রিতা প্রমাণ করতে পারেন। নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে, অপাশ্চাত্যের বহু সমাজে একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক বা আইনী অস্তিত্ব এবং মর্যাদা নির্ধারিত হয় গোষ্ঠী সদস্যপদ দ্বারা। এর বিপরীতে পাশ্চাত্য সমাজে নাগরিকত্বের ধারণা একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক এবং আইনী অধিকার ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করে। গোষ্ঠী হচ্ছে একটি যূথভিত্তিক দল (corporate group)। কোন সদস্য মারা গেলে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। গোষ্ঠী যূথভিত্তিকভাবে সম্পত্তির মালিক, এই দল উৎপাদনমূলক কাজের বিভাজন করে, ফসল-ফসলাদির বণ্টন করে, এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটিকে সামাজিক সংগঠনের একটি শক্তিশালী এবং কার্যকরী ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। গোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহির্বিবাহের রীতি অনুসরণ।

গোষ্ঠী, গোত্র, ফ্রাত্রি এবং ময়টি হচ্ছে স্তরবিন্যস্ত বংশীয় দল।

গোত্র (clan; কিছু নৃবিজ্ঞানী sib পদটি ব্যবহার করেছেন) হচ্ছে দুই বা তার অধিক গোষ্ঠীর একটি জ্ঞাতিদল। এ দলের সদস্যরা একই পূর্বসূরীর উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদের জানেন কিন্তু যে শীর্ষস্থানীয় উত্তরসূরীর মাধ্যমে তারা একে অপরের জ্ঞাতি, সদস্য বৃদ্ধির কারণে এবং বহুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সূত্রিতার ধারা তাদের জানা নেই। গোষ্ঠীর মত গোত্রও একটি বংশীয় দল কিন্তু এটি যূথবদ্ধ নয়। বসবাসের দিক থেকে এটি একীভূত নয় যেমন কিনা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। অন্তত গোষ্ঠীর আকর সদস্যদের ক্ষেত্রে তো বটেই। গোষ্ঠীর মত এটিও হতে পারে পিতৃসূত্রীয় কিংবা মাতৃসূত্রীয় কিংবা অনুষঙ্গিক । গোত্রের সদস্যরা যেহেতু ছড়ানো-ছিটানো সে কারণে ভূমিমালিক হিসেবে গোত্রের কোন যূথবদ্ধ পরিচয় নেই। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এই দল আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠীর মত গোত্রও হতে পারে বহির্বিবাহ ভিত্তিক একটি দল। গোত্র তার সদস্যদের রক্ষা করে বিপদের মুহূর্তে। নৃবিজ্ঞানীদের আর একটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে, যেহেতু গোত্র বসবাসের একক নয়, এটি প্রতীকের মাধ্যমে সংহতি এবং ঐক্য রক্ষা করে। যেমন ধরুন, কোন পশু-পাখি (ঈগল, শেয়াল), প্রাকৃতিক শক্তি (চাঁদ), কিংবা অন্য কোন বস্তু।

চিত্র ১: বংশীয় দলের সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস

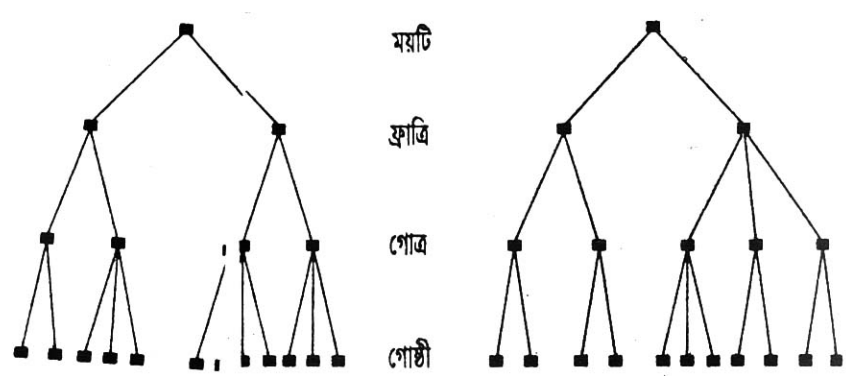

সূত্রঃ William A. Haviland (1999) *Cultural Anthropology*, 9th edition, Florida: Harcourt Brace College Publishers, পৃঃ ৩০৩

ফ্রাত্রি (phratry) হচ্ছে দুই বা তার অধিক গোত্রের একটি একসূত্রীয় জ্ঞাতিদল। ফ্রাত্রির সদস্যরা জানেন যে তারা সকলে একই জ্ঞাতি দলের। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং দীর্ঘ সময়কাল পার হয়ে যাবার কারণে তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীর সাথে সূত্রিতার সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না। সম্পূর্ণ সমাজকে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহলে দুটি ময়টি গঠিত হবে (moiety হচ্ছে একটি ফরাসী শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে অর্ধেক)। ময়টির সদস্যরাও জানেন যে তাঁরা একই পূর্বসূরীর সদস্য কিন্তু সূত্রিতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য তাঁদের আর জানা নেই। গোষ্ঠী এবং গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি আনুগত্য, ফ্রাত্রি এবং ময়টির তুলনায় বেশি। গোষ্ঠী এবং গোত্রের মত ফ্রাত্রি এবং ময়টিও প্রায়শই বহির্বিবাহ ভিত্তিক দল। গোষ্ঠী কিংবা গোত্রের সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ফ্রাত্রি এবং ময়টির সদস্য সাহায্যের হাত বাড়াতে বাধ্য। এক ময়টি আরেক ময়টিকে নির্দিষ্ট কাজে সহায়তা করতে পারে। যেমন ধরুন, কোন ময়টির সদস্য মারা গেলে দাফন কার্যে অন্য ময়টি সাহায্য করে।

এতসব আলোচনার পর মনে হতে পারে পৃথিবীর সকল সমাজে বংশভিত্তিক দল রয়েছে। এটি কিন্তু সঠিক নয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন অনেক সমাজ রয়েছে যেখানে বংশ বা গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্ব নেই। সেই সমাজের জ্ঞাতিব্যবস্থা একেবারে ভিন্ন।

নিচে কেস স্টাডির সাহায্যে বংশধারা নীতি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

একরৈখিক বংশধারা

পিতৃসূত্রীয় বংশধারা: পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বলতে বোঝায় পূর্ব-পুরুষের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্ক নিরূপণ: বাবা, বাবার বাবা, বাবার বাবার বাবা ইত্যাদি। অন্য কথায় বললে, একটি পিতৃসূত্রীয় বংশের সকলেই একই পূর্ব-পুরুষের বংশধর হিসেবে পরিচিত। যেসকল সমাজে পুরুষ-আধিপত্য স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত, এবং সম্পত্তি পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে সকল সমাজে পিতৃসূত্রিতা একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও, যা কিনা সমাজের মূল সাংগঠনিক নীতি হিসেবে কাজ করে। অন্তত, বংশধারা তাত্ত্বিকেরা বিষয়টিকে এভাবেই দেখেছেন।

পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বলতে বোঝায় পূর্ব-পুরুষের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্ক নিরূপণ: বাবা, বাবার বাবা, বাবার বাবার বাবা ইত্যাদি।

এমন কিছু বংশভিত্তিক সমাজ আফ্রিকায় আছে যেখানে কেবলমাত্র সামাজিক নয়, রাজনৈতিক সংগঠনও বংশধারার ভিত্তিতে গঠিত। কিন্তু চীফ বা দলনেতা অনুপস্থিত। নৃবিজ্ঞানী ইভান্স-প্রিচার্ড এর নামকরণ করলেন **খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন** (segmentary lineage organization)। এমন সমাজে, পরিস্থিতি-অনুসারে একটি গোষ্ঠী অন্য আরেকটি গোষ্ঠীর বিপরীতে সংগঠিত হতে পারে। গোষ্ঠী দুটি সমপর্যায়ের হতে হবে; জ্ঞাতি বন্ধনের ঘনত্বের দিক দিয়ে তারা কাছের নয়, বরং দূরের। পূর্ব-পুরুষের, এবং গোষ্ঠীরও, রাজনৈতিক পরিচয় থাকে এসকল সমাজে। এ পরিচয় একজন মানুষের গোষ্ঠী পরিচয়ের মতনই বৃহৎ এবং ব্যাপক হতে পারে। মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা হয় জ্ঞাতিসম্পর্কীয় নৈকট্যের ভিত্তিতে। একটি আরবদেশীয় প্রবাদে বিষয়টা এমনভাবে ধরা পড়ে: "আমার ভাইয়ের বিপরীতে আমি, আমার কাজিনদের বিপরীতে আমার ভাই আর আমি, বিশ্বের বিপরীতে কাজিনরা আর আমি।"

যে সকল নৃবিজ্ঞানী বংশধারা নিয়ে গবেষণা কাজ চালিয়েছেন তাঁদের একটি প্রধান যুক্তি ছিল বংশধারাভিত্তিক সমাজে সামাজিক সংহতি এবং আনুগত্য সংগঠিত হয়ে থাকে বংশধারার ভিত্তিতে। তার অর্থ: যারা কিনা একই বংশের তারা একে অপরের প্রতি আনুগত্যশীল। আনুগত্য প্রকাশিত হতে পারে সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলার ক্ষেত্রে, কিংবা শত্রুপক্ষের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে। এ ধরনের একটি ধ্রুপদী উদাহরণ মেলে হর্ন অফ আফ্রিকা'র লক্ষ লক্ষ সোমালি মেষ পালকদের ক্ষেত্রে। যদি তাদের কাউকে হত্যা করা হয় তাহলে কোন্ গোষ্ঠী মৃত মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য এবং

কাদের কাছে – তা নিয়ে নিত্যদিনের রাজনৈতিক সংহতি আয়োজিত হয়ে থাকে। এ ধরনের খন্ডিত গোষ্ঠী ব্যবস্থায় মনে রাখা দরকার, বংশধারা একটি সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পদ। আবার, একটি অর্থনৈতিক সম্পদও যার অর্থ এবং গুরুত্ব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, পরিস্থিতি অনুসারে তা তৈরি হয়।

পিতার মাধ্যমে বংশধারা প্রবাহিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে পিতৃসূত্রীয় ধরনের ব্যবস্থায় মায়ের পরিপূরক দিক পুরোপুরি বাদ পড়ে যায়। বরং দেখা যায়, ক্ষেত্র-বিশেষে উল্টোটাই ঘটে থাকে।

পিতার মাধ্যমে বংশধারা প্রবাহিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে পিতৃসূত্রীয় ধরনের ব্যবস্থায় মায়ের পরিপূরক দিক পুরোপুরি বাদ পড়ে যায়। বরং দেখা যায়, ক্ষেত্র-বিশেষে উল্টোটাই ঘটে থাকে। নৃবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ হ'ল, যেসকল সমাজে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা কঠোর, সেখানে একজন পুরুষের সাথে তার মাতুলালয়ের বিশেষ ধরনের রীতিবদ্ধ সম্পর্ক উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন আড়াআড়ি কাজিন বিবাহ (cross-cousin marriage)। অর্থাৎ ফুপাত ভাই-মামাত বোনের বিবাহ শুধুমাত্র অনুমোদিত নয়, কাম্য। বংশধারা ব্যবস্থা বিয়ে ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। কেননা বংশের সংজ্ঞার সাথে অজাচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কঠোরভাবে সুসংহত বংশধারা দলের ক্ষেত্রে বহির্বিবাহ নীতি দেখা যায়। বংশের ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, বংশের বাইরে থেকে বিবাহসঙ্গী বাছাই বাঞ্ছনীয়। বিয়েকে দেখা হয়ে থাকে মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের একটি সুযোগ হিসেবে, বিশেষ করে শত্রুদলের সাথে মৈত্রী স্থাপন। এ ধরনের বাক্যে বিষয়টা ধরা পড়েঃ "আমরা শত্রুপক্ষের সাথে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করি।" কিছু পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী তার স্বামীর বংশের সদস্য হয়ে পড়ে, অন্যান্য পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় দেখা গেছে, বিয়ে সত্ত্বেও নারী তার নিজ পিতৃবংশের সদস্য থেকে যাচ্ছেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমাজগুলোতে, আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ানদের মাঝে, এবং লাতিন আমেরিকার সমাজগুলোতে দেখা গেছে, বিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ঘটে থাকে নির্দিষ্ট জ্ঞাতি-শ্রেণীর নারী-পুরুষের মাঝে (prescribed kin-categories)।

চিত্র ২: পিতৃসূত্রীয় বংশধারা

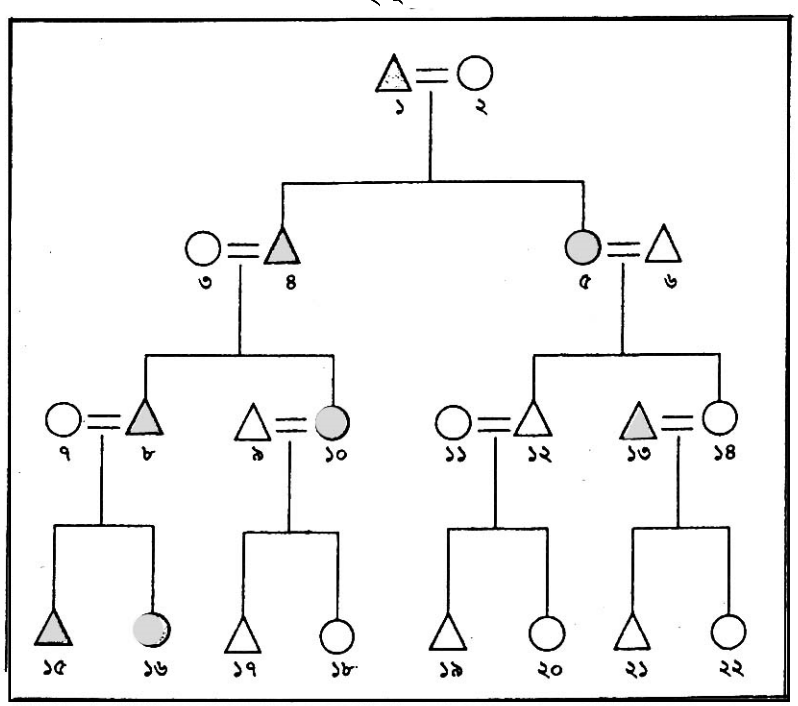

সূত্রঃ Carol R. Ember/Melvin Ember (1990) *Cultural Anthropology*, Instructor's Edition, 6th edition, New Jersey: Prentice-Hall, পৃ: ২০২।

চিত্রের ৪ এবং ৫ নম্বর ব্যক্তি যাঁরা কিনা ১ এবং ২ নম্বরের সন্তান, তাঁরা তাঁদের পিতার বংশের অধিভুক্ত (ভরাট চিহ্ন)। পরবর্তী প্রজন্মে ৩ এবং ৪ নম্বরের সন্তান ভরাট চিহ্নিত বংশের অধিভুক্ত যেহেতু তাঁদের পূর্বসূত্রিতা নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের পিতার মাধ্যমে যিনি ভরাট চিহ্নিত দলের সদস্য। তবে ৫ এবং ৬ নম্বরের সন্তানেরা এই পিতৃবংশের সদস্য নন। যেহেতু তাঁদের বংশসূত্রিতা নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের পিতার মাধ্যমে এবং তিনি এ বংশের নন। অর্থাৎ যদিও ১২ এবং ১৪-এর মা এই ভরাট চিহ্নিত পিতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য, কিন্তু স্বামী (৬ নম্বর) এই পিতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য না হওয়াতে তিনি তাঁর বংশসূত্রিতা সংবহিত করতে পারেন না। তাঁদের সন্তানেরা (১২ এবং ১৪) তাঁদের পিতার বংশের সদস্য। চতুর্থ প্রজন্মে কেবল ১৫ এবং ১৬ হচ্ছেন ভরাট চিহ্নিত পিতৃসূত্রীয় দলের সদস্য যেহেতু তাঁদের পিতা ভরাট চিহ্নিত পিতৃসূত্রীয় দলের পূর্বতন প্রজন্মের একমাত্র পুরুষ সদস্য। এই চিত্রে তাহলে ১, ৪, ৫, ৮, ১০, ১৫ এবং ১৬ পিতৃসূত্রীয় বংশের অধিভুক্ত; অপর সকল সদস্য অন্য পিতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য।

নিচে নাইজেরিয়ার পিতৃসূত্রীয় টিভ জাতির একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হল।

কেস স্টাডি ১ : টিভ সমাজে পিতৃসূত্রীয় পরিব্যাপ্ত পরিবার

টিভ সমাজে উঠান পরিবেষ্টিত দল হচ্ছে গৃহী উৎপাদনের একক। নৃবিজ্ঞানীরা এই দলের নামকরণ উঠান-পরিবেষ্টিত দল করেছেন কারণ এই দলের সদস্যদের ঘর-বাড়ি এবং ধানের গোলা গোল অথবা ডিম্বাকার উঠানকে ঘিরে গড়ে উঠে। মধ্যখানের খোলা উঠান হচ্ছে টিভ পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র। উঠান-পরিবেষ্টিত এই দলের প্রধান হচ্ছেন সেই দলের বয়োজ্যেষ্ঠতম পুরুষ। তিনি ঝগড়া-ফ্যাসাদ মীমাংসা করেন, অলৌকিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং উৎপাদন তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

টিভ সমাজে উঠান পরিবেষ্টিত দল হচ্ছে গৃহী উৎপাদনের একক। এই দলের প্রধান হচ্ছেন সেই দলের বয়োজ্যেষ্ঠতম পুরুষ।

দল প্রধানের সাধারণত একাধিক স্ত্রী থাকে। প্রতিটি স্ত্রীর আছে আলাদা আলাদা ঘর। উঠান-পরিবেষ্টিত এই দলের সদস্যরা হচ্ছেন: প্রধানের অল্প বয়স্ক ও অবিবাহিত সন্তানকুল, এবং বিবাহিত ছেলে ও তাদের স্ত্রী ও সন্তান। পরিব্যাপ্ত (extended) পরিবারের সদস্য আরো হতে পারেন দল প্রধানের ছোট ভাই ও তার স্ত্রী-সন্তানেরা, ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো তার কোন ভাতিজা। বাইরের কিছু মানুষজন যারা এই উঠান পরিবেষ্টিত দলের সাথে থাকেন যেমন কিনা বন্ধু-বান্ধব বা একই বয়সই পুরুষ – তারাও বসবাসের সময়কাল পর্যন্ত এই দলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। উপরের ছকে টিভদের উঠান পরিবেষ্টিত দলকে তুলে ধরা হয়েছে। ছকে পরিবেশন করা হয়েছে বংশকুল এবং পরিসর – দুটোই।

নৃবিজ্ঞানী পল এবং লরা বোহানান-এর মতে যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রতিটি স্ত্রী এবং সন্তান মিলে পৃথক পৃথক গৃহস্থালী গঠন করছেন, কিন্তু আসলে মূল গৃহস্থালী হচ্ছে বৃহত্তর উঠান পরিবেষ্টিত দল এবং এর সাথে যুক্ত বহিরাগত সদস্যবৃন্দ।

চিত্র ৩: উঠান-পরিবেষ্টিত টিভ : পরিবারের মানচিত্র ও বংশকুল

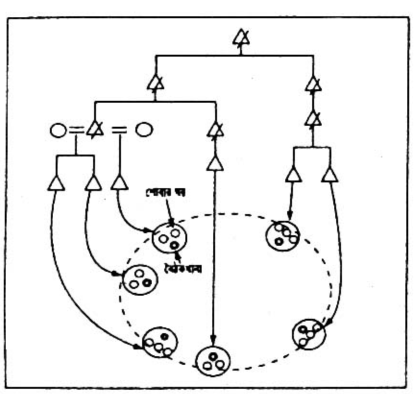

সূত্রঃ Roger M. Keesing (1975) *Kin Groups and Social Structure*, Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher, পৃ: ৩৭।

মাতৃসূত্রীয় বংশধারা ব্যবস্থায় সন্তানেরা তাদের মায়ের গোষ্ঠীর অধিভুক্ত (filiated, filiation) বা সদস্য।

মাতৃসূত্রীয় বংশধারাঃ মাতৃসূত্রীয় বংশধারা ব্যবস্থায় সন্তানেরা তাদের মায়ের গোষ্ঠীর অধিভুক্ত (filiated, filiation) বা সদস্য। অথবা আরো স্পষ্ট করে বললে, সন্তানেরা তাদের মামার দলের অধিভুক্ত কারণ মাতৃসূত্রীয় সমাজে ক্ষমতা এবং মর্যাদা ধারণ করেন পুরুষেরা, যদিও তা প্রবাহিত হয়, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, নারী বংশধরদের মাধ্যমে। মাতৃসূত্রীয় বংশ বলা হয় সেই জ্ঞাতি দলকে যারা একই পূর্বসূরী নারীর বংশধর।

মাতৃসূত্রীয় বংশধারা কিন্তু মাতৃতন্ত্র নয় – নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা বারবার এ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। তার কারণ, এই ব্যবস্থায় পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। পুরুষের কর্তৃত্ব থাকলেও বংশধারার সদস্যপদ কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি অথবা পদ পুরুষ ধারার মাধ্যমে নির্ধারিত নয়। এই ব্যবস্থায় একজন পুরুষ সম্পত্তি পায় তার মায়ের ভাইয়ের কাছ থেকে, এবং তার সন্তানেরা পায় তার স্ত্রীর ভাই হতে। হয়ত এ কারণেই কিছু নৃবিজ্ঞানী একে মাতৃতন্ত্র (অথবা মাতৃ-অধিকার) না বলে, এর নাম দিয়েছেন "ভাই-অধিকার"। ভারতের কেরালা রাজ্যের নায়ারদের মাঝে ছিলো মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা। নায়ার ভাই এবং বোন একই গৃহে বসবাস করতেন, বোনদের স্বামীরা এই ভাই-বোন গৃহে নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। এভাবেই মাতৃসূত্রীয় এই বংশধারার নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হ'ত। কিছু মাতৃসূত্রীয় সমাজে ভিন্ন ধরনের প্রচলন দেখা গেছেঃ এ সমাজগুলোতে স্বামী এবং স্ত্রী নিয়মিত একে অপরের বাসস্থানে যেয়ে কিছুকাল থাকেন।

চিত্র ৪: মাতৃসূত্রীয় বংশধারা

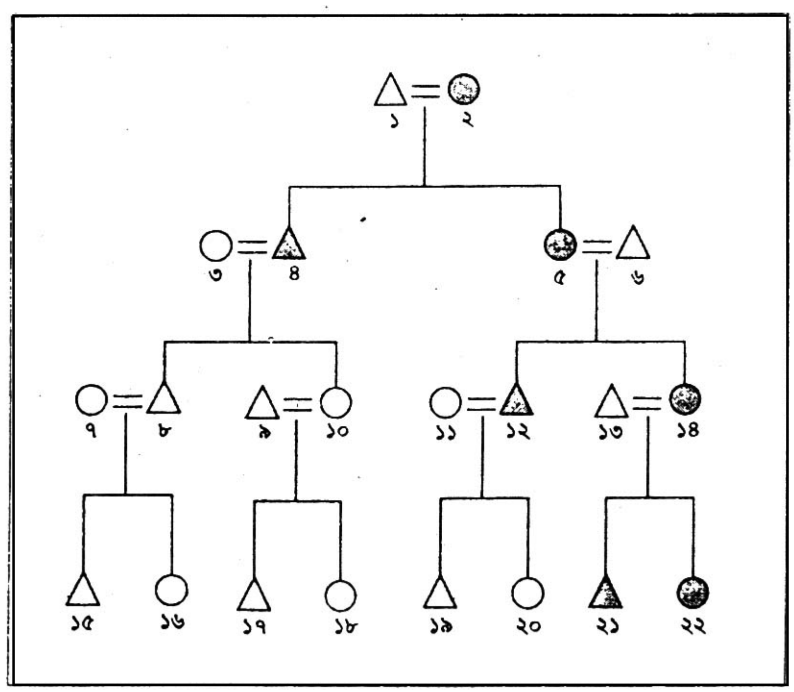

সূত্র: Carol R. Ember/Melvin Ember (1990) *Cultural Anthropology*, Instructor's Edition, 6th edition, New Jersey: Prentice-Hall, পৃ: ২০৩।
৪ এবং ৫ নম্বর ব্যক্তি, যাঁরা ১ এবং ২ নম্বরের সন্তান, তাঁরা তাঁদের মায়ের জ্ঞাতিদলের অধিভুক্ত যা ভরাট চিহ্নের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের, ৫ এবং ৬ নম্বরের সন্তানেরা ভরাট চিহ্নিত বংশীয় দলের অধিভুক্ত কারণ তাঁদের পূর্বসূত্রিতা নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের মায়ের মাধ্যমে, যিনি কিনা অন্য দলে অধিভুক্ত। তাঁদের পিতা যদিও ভরাট চিহ্নিত মাতৃসূত্রীয় দলের সদস্য কিন্তু তিনি তাঁর সদস্য পদ সংবহিত করতে পারেন না যেহেতু এটি মাতৃসূত্রিতার ভিত্তিতে সংবহিত হয়। চতুর্থ প্রজন্মে কেবলমাত্র ২১ এবং ২২ ভরাট চিহ্নিত মাতৃসূত্রীয় দলের সদস্য যেহেতু তাঁদের মা হচ্ছেন পূর্ববর্তী প্রজন্মের একমাত্র অধিভুক্ত নারী সদস্য। মোট কথা, ২, ৪, ৫, ১২, ১৪, ২১ এবং ২২ একই মাতৃসূত্রীয় দলের সদস্য। মাতৃসূত্রিতার এই চিত্র পিতৃসূত্রিতার উল্টো।

নিচে উত্তর আমেরিকার মাতৃসূত্রীয় ইরোকওয়া জনগোষ্ঠীর একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হল। এখানে যে জ্ঞাতি ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে, সেটি উত্তর আমেরিকায় ইউরোপীয় শক্তির অনুপ্রবেশ এবং দখল প্রতিষ্ঠার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন আদিবাসী জাতিরা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সরকার-সৃষ্ট ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষিত অঞ্চলে বসবাসরত।

কেস স্টাডি ২: ইরোকোওয়া মাতৃসূত্রীয় বংশধারা

উত্তর আমেরিকার (বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) উত্তরপূর্ব অঞ্চলের বাসিন্দা ইরোকোয়া মিত্রসংঘ । এই সংঘে আছে ৫টি জাতি – ওনোনডাগা, মোহক্, সেনেকা, ওনাইডা, ক্যায়ুগা – যাদের সংস্কৃতিতে রয়েছে মিল। ইরোকওয়া জ্ঞাতি দলের কেন্দ্রে রয়েছে গৃহস্থালী: মাতৃসূত্রিতার ভিত্তিতে সম্পর্কিত একাধিক অণু পরিবারের বসবাসস্থল হচ্ছে গৃহস্থালী। এই পরিব্যাপ্ত পরিবারের নারীকুল যৌথভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং উদ্যানের দেখভালের দায়িত্বে, তারা একত্রে ভুট্টা এবং অন্যান্য মুখ্য ফসল চাষ করে থাকেন। পুরুষেরা শিকার করেন এবং মাছ ধরেন। গৃহস্থালী নিয়ন্ত্রণ করেন বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা; জড়ায়ুভিত্তিক বসবাসের নীতির কারণে পুরুষেরা হচ্ছেন বহিরাগত। তাদের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয় তাদের মা, এবং তার বংশ পরিচয়ের মাধ্যমে।

ইরোকওয়া জ্ঞাতি দলের কেন্দ্রে রয়েছে গৃহস্থালী: মাতৃসুত্রিতার ভিত্তিতে সম্পর্কিত একাধিক অণু পরিবারের বসবাসস্থল হচ্ছে গৃহস্থালী।

মাতৃসূত্রে সর্ম্পকিত এক গুচ্ছ গৃহস্থালী মিলে গঠিত হয় একটি মাতৃসূত্রীয় গোষ্ঠী। প্রায় সকল অথবা অধিকাংশ গোষ্ঠীর রয়েছে পুরুষ দলপতি। বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা পুরুষ দলপতি বাছাই করেন। মাতৃসূত্রীয় কিছু গোষ্ঠী মিলে গঠিত হয় একটি মাতৃসূত্রীয় বংশ। বংশের সদস্যদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রতিটি [উপ]জাতি-তে থাকে ৮টি বংশ। নির্দিষ্ট কোন একটি মাতৃসূত্রীয় গোষ্ঠী বলতে যেই বিশেষ মাতৃসূত্রীয় গৃহস্থালীগুলোকে বোঝায়, তাঁরা গ্রামের যে কোন একটি অংশে বসবাস করেন। কোন একটি গ্রামে একাধিক মাতৃসূত্রীয় গোষ্ঠী বসবাস করে। মাতৃসূত্রীয় বংশগুলো যূথবদ্ধ । একই মাতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য হলে দুর্দিনে কিংবা সংঘাতের মুহূর্তে সকলে এককাট্টা হয়ে পারস্পরিক সাহায্য প্রদানে বাধ্য।

যেমন গৃহস্থালী, তেমনি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গনেও দেখা যায় ইরাকওয়া নারীদের সমাদর। পাঁচ উপজাতির সম্মিলনে গঠিত ইরোকওয়া মিত্রসংঘ শাসনের দায়িত্বে রয়েছেন ৫০ জন সাচেম-এর একটি পরিষদ। সাচেমরা হচ্ছেন পুরুষ দলপতি; শান্তি-রক্ষা এবং বহির্দলের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা তাঁদের কাজ। সাচেমের পদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ইরোকোয়া মিত্রসংঘের সাচেম পরিষদের সদস্যরা নিজ-নিজ উপজাতিকে প্রতিনিধিত্ব করেন; আবার প্রতিটি উপজাতির অভ্যন্তরে আছে ছোট সাচেম পরিষদ, এই পরিষদের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ মাতৃবংশকে প্রতিনিধিত্ব করেন। মাতৃসূত্রিতার ভিত্তিতে সাচেম নিযুক্ত হন। যদি কোন সাচেম মারা যান তাহলে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা মিলে নতুন সাচেম নিযুক্ত করেন। যদি নতুন সাচেম অল্পবয়স্ক হন তাহলে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নারী তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সকল সাচেম পদের মান-মর্যাদা এক নয়। কিছু সাচেম পদ গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ওনোনডাগা উপজাতির ৩টি সাচেম পদ।

শ্রাদ্ধ এবং মৃত্যু শোক আয়োজন নারীদের কাজ। ইরোকওয়াদের মাঝে দলপতির পদ সংরক্ষিত হয় প্রতীকী অর্থে বেল্ট দ্বারা। এই বেল্ট বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের হাতে থাকে। পারিষদের সিদ্ধান্ত নারীরা প্রভাবিত করতে পারেন:

বংশের সাচেমের সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলে অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে। সিদ্ধান্ত যেহেতু ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয় সেহেতু নারী মুরুব্বীদের অপছন্দের কোন সিদ্ধান্ত পাশ করানো মুশকিল। যুদ্ধ পরিচালনার কোন সিদ্ধান্ত নারী মুরুব্বীদের অপছন্দের হলে তারা সৈনিকদের খাবার রসদ (ভুট্টা) দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারতেন।

অন-একরৈখিক বংশধারা

অনুষঙ্গিক বংশধারা: অনুষঙ্গিক বংশধারা নীতি বলতে নৃবিজ্ঞানীগণ বোঝেন সেইসব গোষ্ঠী যাদের বংশীয় পরিচয় সমানভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে পুরুষ এবং নারীর মাধ্যমে অথবা দুটোর সংমিশ্রনের মাধ্যমে। একরৈখিক সূত্রিতা এবং অন-একরৈখিক সূত্রিতা – এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মিলও রয়েছে এই অর্থে যে, বংশীয় পরিচয় নির্ধারিত হয়ে থাকে পূর্বসূত্রিতার মাধ্যমে। অনুষঙ্গিক নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত বংশীয় দল হচ্ছে সেটি যার সদস্য নির্ধারিত হতে পারে পূর্বপুরুষ অথবা পূর্বনারীর মাধ্যমে, একাদিক্রমে পুরুষ অথবা নারী সূত্রিতার মাধ্যমে, অথবা এ দুটো সূত্রিতার বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে। অন্য কথায়, পূর্বসূরী যেমন হতে পারেন নারী কিংবা পুরুষ, আবার একই সাথে, সেই পূর্বসূরীর সাথে সূত্রিতার সম্পর্ক একান্তভাবে নারী বা পুরুষের মাধ্যমে নয়।

অনুষঙ্গিক বংশধারা নীতি বলতে বোঝায় যেখানে বংশীয় পরিচয় সমানভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে পুরুষ এবং নারীর মাধ্যমে অথবা দুটোর সংমিশ্রনের মাধ্যমে।

নীচে আফ্রিকা মহাদেশের জাম্বিয়ার টকা জনগোষ্ঠীর কেস স্টাডি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

কেস স্টাডি ৩ : টকা অনুষঙ্গিক বংশধারা

জাম্বিয়ার দক্ষিণে বসবাস করে টকা জনগোষ্ঠী। টকা ভাষায় বংশ হচ্ছে মুকওয়া । আর মুকওয়ার সদস্যদের ডাকা হয় বাসিমুকওয়া। যারা সকলে একই বাসিমুকওয়ার তারা একই আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে, তারা সকলেই নির্দিষ্ট ভূখন্ডের যৌথ অধিকারী, কোন বাসিমুকওয়া মারা গেলে উত্তরসূরী হিসেবে তারা সকলেই সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী এবং তাদেরই কে কোন্ পদের স্থলাভিষিক্ত হবে, সে ব্যাপারে মতামত প্রদান করে থাকেন। এই অর্থে বলা যেতে পারে, মুকওয়া হচ্ছে একটি সম্প্রদায় – একই মুকওয়ার সদস্য হওয়া মানে তারা সকলেই একসাথে বসবাস করে, তারা শরীকী এবং একই স্বার্থ সংরক্ষণ করে। মুকওয়ার সদস্য হচ্ছেন সেই যে কিনা পূর্বনারী অথবা পূর্বপুরুষ, যে কোন সূত্রে সম্পর্কযুক্ততা প্রমাণ করতে পারেন।

সারাংশ

বিংশ শতকের প্রথম দিকে চর্চিত "জ্ঞাতি এলজেব্রা" (যার নমুনা পেলেন এই ইউনিটের ৩ নম্বর পাঠে) থেকে নৃবিজ্ঞানীরা সরে এসেছেন। সরে এসে তাঁরা জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নকে কিভাবে ক্রিয়াবাদী পরিকাঠামোর সাহায্যে ঢেলে সাজালেন, এবং তার ফলে কি ধরনের তত্ত্ব দাঁড় করালেন – সেটাই ছিল এ পাঠের বিষয়বস্তু। নৃবিজ্ঞানে তাত্ত্বিক মোড় ঘোরানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হচ্ছে বংশধারা তত্ত্ব। বংশধারা তত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সামাজিক প্রেক্ষিতের উপর: জ্ঞাতিত্ব কোন্ সমাজে কি ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে। মনোযাগ দিয়ে ইরোকওয়া কেইস স্টাডি পড়লে বোঝা যায় ইরোকওয়া মিত্র সংঘের ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠন: গৃহস্থালী/পরিব্যপ্ত পরিবার, বংশ, গোষ্ঠী, (উপ) জাতি, মিত্রসংঘ। প্রতিটি পর্যায়ের জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠনগুলো কেবলমাত্র সামাজিক ভূমিকা পালন করে না, এগুলো একইসাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকাও পালন করে থাকে। বংশধারা তাত্ত্বিকদের লেখালেখি পড়ে মনে হতে পারে যে পৃথিবীর সকল সমাজে, বংশীয় দল বিদ্যমান। বাস্তবে যে তা নয়, সেটি আগামী পাঠের বিষয়বস্তু। তাতে আলোচনা করা হবে মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব, যার আবির্ভাব বংশ ধারা তত্ত্বকে স্- ান করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নিচের কোন পরিবার পিতৃসূত্রীয় পরিবার ?

ক. টিভ সমাজ	খ. ইরোকোওয়া
গ. টকা	ঘ. নুয়ের

২। Moiety শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. ইংরেজি	খ. গ্রীক
গ. ল্যাটিন	ঘ. ফরাসী

৩। দুই বা তার অধিক গোত্রের একটি একসূত্রীয় জ্ঞাতিদল হচ্ছে -

ক. গোষ্ঠী	খ. গোষ্ঠী
গ. ফ্রাত্রি	ঘ. ময়টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বংশধারা কী?

২। উত্তরাধিকার এবং পারম্পর্য বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বংশধারার মূলনীতি আলোচনা করুন।

২। কেস স্টাডির সাহায্যে পিতৃসূত্রীয় অথবা মাতৃসূত্রীয় বংশধারা আলোচনা করুন।

অনুশীলনী : এই ইউনিটের ৩ নম্বর পাঠে জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কের যে চিত্র আছে সেটি অনুসরণ করে আপনার নিজ বংশের একটি চিত্র তৈরি করুন। প্রতিটি সংকেতের পাশে প্রতিটি ব্যক্তির নাম লিখুন। যেমন, আপনার দাদার নাম, আপনার ভাতিজার নাম ইত্যাদি।

পাঠ - ৫

মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব
Alliance Theory

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- অজাচার, বিয়ে সম্বন্ধে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ধ্যানধারণা
- অজাচার এবং বিবাহের রীতিনীতি সম্বন্ধে লেভি-স্ট্রস'এর নতুন ব্যাখ্যা
- বিবাহের রীতিনীতি বিশ্লেষণে "নিষেধাজ্ঞা"-র পরিবর্তে, এর ইতিবাচক দিক বিবেচনা করা
- লেভি-স্ট্রসের নারী বিনিময় ধারণা

কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রসের নামের সাথে মৈত্রী-বন্ধন তত্ত্ব সবচাইতে বেশি যুক্ত। লেভি-স্ট্রস তাঁর তত্ত্বে, বংশধারার পরিবর্তে মৈত্রীবন্ধনের কাঠামোগত এবং সাংগঠনিক দিকের উপর জোর দিয়েছেন । *দ্য এলিমেন্টারি স্ট্রাকচারস অফ কিনশিপ* (১৯৬৯) বইয়ে তিনি মৈত্রী-বন্ধন তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন।

বংশধারা তাত্ত্বিকেরা প্রধানত একটি বিষয় নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন: কি উপায়ে প্রাক-রাষ্ট্রীয় সমাজ টিকে থাকে এবং কিভাবে নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা ঠেকানো হয়। এই তত্ত্ব-অনুসারে, বংশধারা দল আদিম মানুষজনের মাঝে স্থিতিশীলতা তৈরি করে। এই তত্ত্ব প্রথম দাঁড় করান বৃটেনের নৃবিজ্ঞানী যাঁরা কাজ করেছেন আফ্রিকার কিছু, যাকে বলা হয়, অ-রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রবিহীন সমাজ নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে এই তত্ত্ব বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় আমদানি করা হয়। উল্লেখ করা জরুরী, নতুন স্থানে এই তত্ত্ব খুব বেশি ভালো কাজ করেনি। সাম্প্রতিক কালের নৃবিজ্ঞানীদের মতে, স্থিতিশীলতার বিষয়টি বিভিন্নভাবে বারে-বারে ঔপনিবেশিক সময়কালে নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গটি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বংশধারা তত্ত্ব যখন জ্ঞাতি তত্ত্বের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত সে সময়ে লেভি-স্ট্রসের মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব (alliance theory) প্রকাশ পায়।

অজাচার সম্বন্ধে নৃবিজ্ঞানী মহলে প্রচলিত ধারণা

বহির্বিবাহের বিধিমালা বলতে বোঝায়: সেই নীতি যার ভিত্তিতে স্পষ্ট করে তোলা হয় কোন জ্ঞাতি দলের সদস্যদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ।

জোড়বন্ধন (বা mating অর্থাৎ, নারী এবং পুরুষের যৌন সম্মিলন/সহবাস বা বিবাহ)-এর ক্ষেত্রে অজাচার বিধিনিষেধ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ – নৃবিজ্ঞানীরা এটা মনে করতেন। বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতিকুলের মাঝে যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ: এটাকে অজাচার নিষেধাজ্ঞা বলা হয়ে থাকে (অজাচার বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে ইউনিট ৪-এর ২ নম্বর পাঠে)। পাশ্চাত্য সমাজগুলোতে অজাচার বলতে বোঝায় নিজ বাবা বা মা, নিজ ভাই বা বোন – এদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন। কিন্তু পৃথিবীর বহু সমাজে অজাচারের ধারণা এতটা সংকীর্ণ বা সীমিত নয়। যেমন ধরুন সুদানের **নুয়ের সমাজ**। নৃবিজ্ঞানী ইভান্স-প্রিচার্ড সে সমাজে গবেষণা করেন এবং তাঁর গবেষণা কাজ হতে স্পষ্ট যে নুয়েরদের অজাচার সম্পর্কিত যৌন বিধিনিষেধ অনুসারে – (ক) একই গোত্রের সদস্যদের মাঝে (খ) ছয় প্রজন্মের অনুষঙ্গিক জ্ঞাতির মাঝে এবং (গ) একজন নারীর তার শ্বশুরকূলের পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন – অজাচার হিসেবে বিবেচিত। অজাচার নিষেধাজ্ঞার সাথে যুক্ত বহির্বিবাহ এবং অন্তর্বিবাহ, এই নীতিমালাগুলো। নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, প্রতিটি সমাজে বহির্বিবাহ এবং অন্তর্বিবাহের নীতিমালা বিদ্যমান। *বহির্বিবাহের বিধিমালা* বলতে বোঝায়: সেই নীতি যার ভিত্তিতে স্পষ্ট করে তোলা হয় কোন জ্ঞাতি দলের সদস্যদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, বিয়ের সম্পর্ক হতে হবে বিশেষ জ্ঞাতি দলের বাইরের কারো সাথে। একারণেই একে বহির্বিবাহ রীতি বলা হয়ে থাকে।

অন্তর্বিবাহের বিধিমালা হচ্ছে তার বিপরীত: প্রতিটি সমাজে বিশেষ কিছু জ্ঞাতি দল হতে বিবাহ সঙ্গী বাছাই করা বাঞ্ছনীয়। এতে বোঝান হচ্ছে সেই দল যাদের সাথে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন অনুমোদিত বা বাঞ্ছনীয়।

লেভি-স্ট্রসের পূর্বে নৃবিজ্ঞানীরা *যৌন বিধিমালা* এবং *বিয়ের বিধিমালা*, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এরূপ: বিয়ে ছাড়াও যৌন সম্পর্ক ঘটতে পারে কিন্তু তার উল্টোটা, মানে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হবে কিন্তু শরীরী মিলন হবে না, তা কিন্তু কোন সমাজে ঘটতে দেখা যায় না। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু সমাজে এমনটা দেখা যায় যে, কিছু জ্ঞাতি সম্পর্কের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক যেমন নিষিদ্ধ করা হয় কিন্তু যৌনমিলন যদি ঘটে যায় তাহলে সেটা অনুমোদনযোগ্য না হলেও বরদাশ্‌ত করা হয়।

লেভি-স্ট্রস কর্তৃক অজাচার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার প্রত্যাখ্যান

লেভি-স্ট্রস যে বিষয়টির উপর জোরারোপ করেছেন তা হলো : বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে বিয়ে নিষিদ্ধ করার চাইতে বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে বিয়ে বাঞ্ছনীয় করে তোলা হয়।

লেভি-স্ট্রসের দৃষ্টিতে যৌন বিধিনিষেধ এবং বিয়ের বিধিনিষেধ – এ দুয়ের পার্থক্য টানা জরুরী নয়। তাঁর কথা হ'ল: মূল বিষয় হচ্ছে *অজাচার*। বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে বিয়ে নিষিদ্ধ করার চাইতে বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে বিয়ে বাঞ্ছনীয় করে তোলা হয়। অজাচার নিষেধাজ্ঞার কারণ আলোচনা করতে যেয়ে তিনি টায়লরকে অনুসরণ করেন। প্রায় ৬০ বছর পূর্বে টায়লর বহির্বিবাহ-সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছিলেন, সমাজকে সুসংহত রাখার পিছনে বিয়ের মাধ্যমে স্থাপিত মৈত্রীবন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টায়লরের যুক্তি ছিলো: আদিম সময়কালে পরিবারের পক্ষে নিঃসঙ্গভাবে টিকে থাকা কঠিন ছিলো। বড় ধরনের শিকার অভিযানে যেতে কিংবা শত্রু থেকে আত্মপক্ষ রক্ষা করতে হলে অন্যান্য পরিবার ও বন্ধুমহলের সাহায্য ছিলো বাঞ্ছনীয়। মিত্রসুলভ সম্পর্ক স্থাপনে বিয়ের ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অজাচার নিষেধাজ্ঞার মূল বিষয় কিন্তু এই নয় যে, নিজ বোন কিংবা মা কিংবা কন্যার সাথে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। বরং, অজাচার নিষেধাজ্ঞার মূল বিষয় হচ্ছে অপরের কাছে নিজ বোন কিংবা মা কিংবা কন্যা প্রদান।

টায়লরের ভাষায়, রাস্তা ছিলো দুটো: হয় বাইরের দলগুলোর সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা আর না হয় তাদের আক্রমনের শিকার হওয়া। লেভি-স্ট্রস একই যুক্তি ধরে এগোন। তিনি বলেন, অজাচার নিষেধাজ্ঞার মূল বিষয় কিন্তু এই নয় যে, নিজ বোন কিংবা মা কিংবা কন্যার সাথে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। বরং, অজাচার নিষেধাজ্ঞার মূল বিষয় হচ্ছে অপরের কাছে নিজ বোন কিংবা মা কিংবা কন্যা প্রদান। তাঁর বক্তব্যের সমর্থন তিনি নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মীড-এর **আরাপেশ**দের মাঝে করা গবেষণা কাজে খুঁজে পান। মীড যখন আরাপেশ তথ্যদাতাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, বোনের সাথে জোড়বন্ধনের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় কিনা, উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন :

> কখনোই না, তাঁরা বলেন: "না আমরা আমাদের বোনদের সাথে সহবাস করি না। আমরা অন্য পুরুষদের কাছে আমাদের বোনদের প্রদান করি আর অন্য পুরুষেরা ওদের বোন আমাদের কাছে দেয়"। নৃবিজ্ঞানী [মার্গারেট মীড] প্রসঙ্গটি আবার তুললেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যদিও এটা অসম্ভব মনে হচ্ছে কিন্তু যদি কোনভাবে এটা ঘটে যায় তাহলে আপনারা এটাকে কিভাবে দেখবেন, কি ভাষায় এ নিয়ে কথা বলবেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তথ্যদাতাদের কষ্ট হ'ল, এমন পরিস্থিতি ঘটার কথা যেহেতু ভাবাই যায় না। "কি, নিজের বোনকে বিয়ে করা! আচ্ছা, তোমার হয়েছেটা কি বল তো? তুমি কি ভগ্নিপতি চাও না? তুমি কি বোঝ না যে তুমি যদি অন্য কোন পুরুষের বোনকে বিয়ে কর এবং অন্য কোন পুরুষ যদি তোমার বোনকে বিয়ে করে তাহলে তুমি পাবে দুজন brother-in-law (বাঙ্গালি মুসলমান জ্ঞাতিত্ব ভাষায় "ভগ্নিপতি" এবং "সম্বন্ধি"), আর তুমি যদি নিজ বোনকে বিয়ে কর তাহলে তুমি একজনও পাবে না? [এই অবস্থায়] তুমি কার সাথে শিকারে যাবে, কার সাথে তুমি উদ্যান চাষ করবে, কার সাথে বেড়াতে যাবে?"

(লেভি-স্ট্রস, ১৯৬৯ : ৪৮৫)

এই ঘটনা লেভি-স্ট্রসের বক্তব্যকে ভালভাবে ব্যাখ্যা দান করে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে: অজাচার নিষেধাজ্ঞা মূল বিষয় নয়। অজাচার নিষেধাজ্ঞা গুরুত্ব আরোপ করে কাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তার উপর। কিন্তু

মূল বিষয় হচ্ছে, সামাজিকভাবে কাদের সাথে বিবাহ বন্ধন (অর্থাৎ, মৈত্রী স্থাপন) অনুমোদিত বা বাঞ্ছনীয়।

বংশধারা তাত্ত্বিকদের থেকে লেভি-স্ট্রসের তত্ত্ব খুবই ভিন্ন। তাঁদের দৃষ্টিতে, "আদিম" সমাজের সামাজিক সংগঠনের মূলে রয়েছে বংশভিত্তিক সংগঠন। বংশভিত্তিক সংগঠনের কারণেই এই সমাজগুলো স্থিতিশীল। সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়টি ঔপনিবেশিক শাসকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং হাল-আমলের অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে, ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীরা বারে বারে অ-ইউরোপীয় সমাজের স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি অনুসন্ধান করাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখেন। বংশধারা তাত্ত্বিকদের থেকে লেভি-স্ট্রসের ভিন্নতা এখানেই যে তাঁর মতে, আদিম সমাজ বংশ-ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে টিকে থাকে না, বরং একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে টিকে থাকে। এই বিশেষ সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নাম লেভি-স্ট্রস রাখেন "মৈত্রী বন্ধন" । লেভি-স্ট্রসের দৃষ্টিতে, যে সমাজগুলো আদিম, সেগুলোর আছে একটি "মৌলিক কাঠামো"। আদিবাসী অস্ট্রেলীয়দের মাঝে এই মৌলিক কাঠামো পাওয়া যায়, আরো পাওয়া যায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতে, এবং দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মাঝে। এইসব অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজে যে মৌলিক কাঠামো লক্ষ্য করা যায় তা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং ইনুইত (এস্কিমো)-দের "জটিল কাঠামো"র বিপরীত। যে সকল সমাজে জটিল কাঠামো বিদ্যমান সেখানকার বিবাহ-রীতি, লেভি-স্ট্রসের ভাষায়, "নেতিবাচক"। তিনি নেতিবাচক বলেছেন এই কারণে, যেহেতু এই নিয়ম বলে দিচ্ছে কাকে বিয়ে করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে একই রক্তের ভাই বা বোনকে বিয়ে করা যাবে না, অথবা বাবা-মাকে বিয়ে করা যাবে না। পক্ষান্তরে, লেভি-স্ট্রসের দৃষ্টিতে, মৌলিক কাঠামো-ভিত্তিক সমাজের বিবাহ-রীতি "ইতিবাচক" কারণ কাকে বিয়ে করা *উচিত*, সেটা বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে।

লেভি-স্ট্রসের বই মূলত মৌলিক কাঠামো নিয়ে: তাঁর দৃষ্টিতে বিবাহ-রীতি সমাজকে সুসংহত করে তোলে। তাঁর যুক্তিকে তিনি এভাবে দাঁড় করাচ্ছেন: মৌলিক কাঠামো দুই ধরনের। প্রথম ধরনের মৌলিক কাঠামোতে দুটি দল থাকে, ধরুন "ক" এবং "খ"। এ ধরনের সমাজের ইতিবাচক বিবাহ-রীতি মোতাবেক "ক" দলের মানুষজনের বিয়ে করা উচিত "খ" দলের মানুষজনকে, আর "খ" দলের মানুষজনের বিয়ে করা উচিত "ক" দলের লোকজনকে। লেভি-স্ট্রস এ ধরনের ব্যবস্থার নামকরণ করেছেন *"প্রত্যক্ষ বিনিময়"*। তাঁর যুক্তি হ'ল, তিনি যাদের মাঝে গবেষণা কাজ করেছেন, সে সমাজের মানুষেরা বিষয়টাকে দেখেন একদল হতে আরেক দলে নারীর বিনিময় হিসেবে। দ্বিতীয় ধরনের মৌলিক কাঠামোর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে *"অপ্রত্যক্ষ বিনিময়"*। এই সমাজের রীতি ভিন্ন কারণ এখানে দলের সংখ্যা দুয়ের অধিক। বেশী সংখ্যক দল হলে সামাজিক সংহতি ভিন্নভাবে ঘটে থাকে ভিন্ন ধরনের বিবাহ-রীতির মাধ্যমে। এখানে "ক" দলের মানুষজনের "খ" দলের মানুষজনকে বিয়ে করার নিয়ম রয়েছে, কিন্তু "খ" দলের মানুষজন "ক" দলের লোকজনকে বিয়ে না করে বরং "গ" দলের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবার দেখা যায়, "গ" দলের মানুষজন বিয়ে করছেন "ক" দলে। অপ্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থায় বিয়ে ঘটে চক্রাকারভাবে, এই চক্রের কোন পর্যায়ে ইতি টানা হয় না (যেমন কিনা প্রত্যক্ষ বিয়ে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঘটে)।

লেভি-স্ট্রস তাঁর মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব দাঁড় করান ক্রস-কাজিন বিবাহ ব্যবস্থা (ফুপাত-মামাত ভাই ও বোন) যে সকল সমাজে প্রচলিত তার প্রেক্ষিতে। তাঁর মতে, এই বিবাহ ব্যবস্থা নারী বিনিময় ব্যবস্থার অংশ। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দলগুলো নারী বিনিময়ের মাধ্যমে স্থায়ী মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। দুই পরিবার বা দলের মধ্যে নারী বিনিময় আন্তঃনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করে তোলে। যদি নারী বিনিময় না ঘটে, যদি নিজ দল হতে বিবাহ সঙ্গী বাছাই করা হ'ত তাহলে এই মৈত্রী তৈরি হ'ত না, সংহতি তৈরী হ'ত না। বহির্বিবাহ রীতি পারিবারিক বিনিময় নিশ্চিত করে এবং এর মাধ্যমে বৃহত্তর ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি সম্ভব করে। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী মার্সেল মস অনুসারে, লেভি-স্ট্রস মনে করতেন উপহার বিনিময় হচ্ছে

যদি নারী বিনিময় না ঘটে, যদি নিজ দল হতে বিবাহ সঙ্গী বাছাই করা হ'ত তাহলে এই মৈত্রী তৈরি হ'ত না, সংহতি তৈরী হ'ত না।

পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীলতার প্রতীকী রূপ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে: পরিবার এবং দল অন্য কিছু বিনিময় না করে কেন নারীদের বিনিময় করবেন? তাঁর উত্তর ছিল এরকম: যদি দুই দলের মধ্যে নারী বিনিমিত না হয়ে কোন বস্তু'র বিনিময় ঘটত তাহলে একবার বস্তু হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর সেই সম্পর্ক থাকত না যা কিনা নারী বিনিমিত হওয়ার কারণে সম্ভব। বস্তু বিনিময় প্রথার পূর্বে নারী বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল – এই ছিল লেভি-স্ট্রসের অভিমত।

ইতিবাচক বিবাহ-নীতির গুরুত্ব এর আগেও দৃষ্টি কেড়েছিল নৃবিজ্ঞানীদের। দলকে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে বিয়ের গুরুত্ব ধরা পড়েছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলে করা বৃটিশ এবং ওলন্দাজ নৃবিজ্ঞানীদের কাজে। তবে নিশ্চিতভাবেই লেভি-স্ট্রসের তত্ত্বের ছিল বিস্তৃতি। প্রকাশনার পর থেকে এই বইটি যেমন সমাদর পেয়েছে, আবার সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত, বিবর্তনবাদী বক্তব্যের কারণে এই বইটি সমালোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লীচ মায়ানমার (পূর্বে বার্মা নামে পরিচিত)-এ সম্পন্ন করা কাজের ভিত্তিতে বলেন, বিবাহ-নীতি বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সঙ্গত নয়। সবসময় এ নীতিগুলোকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদির প্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। তৃতীয়ত, বিবাহ-নীতি এবং সংযুক্তকরণের যে আবশ্যিক সম্পর্ক লেভি-স্ট্রস দেখেছেন, তাকে প্রশ্ন-সাপেক্ষ করে তোলেন লুই ডুমো। ডুমো বলেন, যদিও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে লেভি-স্ট্রস যাকে বলবেন "মৌলিক কাঠামো", তা আছে, কিন্তু এই নীতির সামাজিক অর্থ সকল স্থানের জন্য একরকম নয়। যেমন ধরুন, দক্ষিণ ভারতে যদিও বা বিবাহ-বন্ধন স্থাপনের মধ্য দিয়ে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু একই কথা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে বলা যায় না।

সারাংশ

"জ্ঞাতি বীজগণিত"-এর স্থলে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে, বংশধারা তত্ত্ব জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নে কেন্দ্রীয় জায়গা দখল করে নেয়। বেশ কয়েক দশক পর্যন্ত এই তত্ত্ব ছিল অপরিবর্তিত। লেভি-স্ট্রসের মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব বংশধারা তত্ত্বের গুরুত্বকে লাঘব করে দেয়। বংশধারা তত্ত্বের কারণে বংশ, গোষ্ঠী এবং জৈবিক সূত্রিতার বিষয়গুলি জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের কেন্দ্রে ছিল। লেভি-স্ট্রসের তাত্ত্বিক উদ্ভাবনের কারণে জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের কেন্দ্রে চলে আসে মৈত্রী স্থাপনের বিষয়টি। বংশধারা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে তিনি বলেন, আদিম সমাজ বংশভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয় না। বরং, এ সমাজগুলো সংরক্ষিত হয় বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। অজাচার, বিবাহের নিষেধাজ্ঞা, যৌন নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে যে ধ্যান-ধারণা নৃবৈজ্ঞানিক মহলে প্রচলিত, লেভি-স্ট্রস সেগুলোকে প্রত্যাখান করেন। লেভি-স্ট্রসের পূর্বে নৃবিজ্ঞানীরা এগুলোকে নেতিবাচক রীতিনীতি ("নিষেধাজ্ঞা") হিসেবে দেখতেন। দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গি লেভি-স্ট্রস উল্টে দেন। তাঁর চিন্তা যে বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক গুরুত্ব আরোপ করে তা হ'ল: বিয়ের সম্পর্ক (এবং সামাজিক সম্পর্ক) বুঝতে হলে কোন্ কোন্ ধরনের সম্পর্ক স্থাপন সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ – এভাবে না দেখে সামাজিক রীতি-নীতিগুলো কি হাসিল করতে চাচ্ছে – সেভাবে দেখা আরো কাজের। বিয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণে তিনি গোত্রের আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলীর চাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন বিনিময় এবং পারস্পরিকতার উপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নিচের কোন নৃবিজ্ঞানী মৈত্রী-বান্ধন তত্ত্বের সাথে সবচাইতে বেশী যুক্ত?
ক. লুইস হেনরী মর্গান
খ. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন
গ. ব্রনিস্ল ম্যালিনোস্কি
ঘ. ক্লদ লেভী-স্ট্রস

২। লেভি-স্ট্রস তাঁর মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব দাঁড় করান কোন বিবাহ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে?
ক. ক্রস-কাজিন বিবাহ ব্যবস্থা
খ. প্যারালাল-কাজিন বিবাহ ব্যবস্থা
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বহির্বিবাহের এবং অন্তর্বিবাহের নীতিমালা বলতে নৃবিজ্ঞানীরা কি বুঝিয়েছেন?

২। লেভি-স্ট্রস অজাচারকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অজাচার বিশ্লেষণে লেভি-স্ট্রস নিষেধাজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি, করেছেন বিবাহের ইতিবাচক রীতিনীতির উপর। আলোচনা করুন।

২। বংশধারা তাত্ত্বিকদের মতে, বংশ সমাজকে টিকিয়ে রাখে। লেভি-স্ট্রসের মতে, মৈত্রী-স্থাপন সমাজকে টিকিয়ে রাখে। আলোচনা করুন।